গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৭ বর্ষ ৩০ সংখ্যা ১৩ - ১৯ মার্চ, ২০১৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

মহান মার্কস স্মরণে

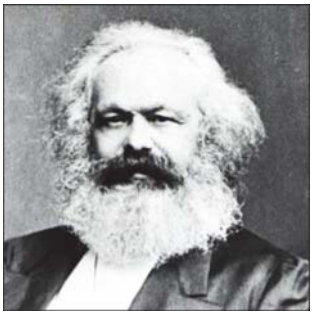

৫ মার্চ ১৮১৮ — ১৪ মার্চ ১৮৮৩

১৪ মার্চ সাম্যবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ মহান কার্ল মার্কসের স্মরণ দিবস। এই উপলক্ষে তাঁর অমূল্য রচনা থেকে কিছু অংশ এখানে প্রকাশ করা হল।

১৮৪৮-এর তথাকথিত বিপ্লবগুলি হচ্ছে নগণ্য ঘটনামাত্র— এগুলি ছিল ইউরোপীয় সমাজের শক্ত আবরণে ছোট ছোট ভাঙন ও ফাটল। কিন্তু তা সমাজের তলাকার অবস্থার জানান দিয়েছিল। সমাজের এই আপাত-কঠিন উপরিভাগের নিচে তরল বস্তু-সমুদ্রের অস্তিত্ব তাতে ধরা পড়ে, যা স্ফীত হয়ে উঠলেই উপরের প্রস্তর কঠিন মহাদেশগুলি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। বিভ্রান্তভাবে এবং হইচই করে এই বিপ্লবগুলি ঘোষণা করল প্রলেতারিয়েতের মুক্তিবার্তা, যা ছিল উনিশ শতকের এবং সে শতকের বিপ্লবের গোপন কথা।

অবশ্য, এই সামাজিক বিপ্লবটি ১৮৪৮ সালে উদ্ভাবিত কোনও অভিনব সামগ্রী ছিল না। স্টিম, বিদ্যুৎ ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলি বার্বে, রাস্পাই এবং ব্লাঙ্কির মতো মানুষের চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক চরিত্রের বিপ্লবী। কিন্তু, যে পরিবেশের মধ্যে আমরা আছি তা যে প্রত্যেকের উপর ২০,০০০ পাউন্ড ওজনের চাপ দিচ্ছে, তা কি আপনারা অনুভব করেন? ১৮৪৮-এর পূর্বেকার ইউরোপীয় সমাজও অনুভব করেনি যে, বৈপ্লবিক পরিবেশ তাকে পরিবেষ্টিত করে চতুর্দিক থেকে চাপ দিচ্ছিল। আমাদের এই উনবিংশ শতাব্দীর বিশেষত্ব হিসেবে একটি বিরাট সত্য রয়েছে, যাকে কোনও পার্টিই অস্বীকার করতে সাহস পায় না।

একদিকে শুরু হয়েছে শিল্প ও বিজ্ঞানের এমন অগ্রগতি যা মানুষের

ছয়ের পাতায় দেখুন

নির্ভয়া তথ্যচিত্র বিতর্ক

আবার এক নির্মম সত্যের সামনে দাঁড় করাল আমাদের

নির্ভয়া আজও মরেনি। তার স্মৃতি আজও সজীব থেকে একদিকে শাসকদের ভয় দেখাচ্ছে যে, দেশের ছাত্র-যুবকরা আবার প্রবল রোষে ফেটে পড়তে পারে। হয়তো এই ভয়েই নির্ভয়ার উপর নির্মিত তথ্যচিত্র 'ইন্ডিয়াস ডটার' দেখানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল সরকার। অন্যদিকে নির্ভয়ার স্মৃতি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বহুজনকে মুখ খুলতে সাহস জুগিয়েছে।

নির্ভয়াকে ধর্ষণ ও খুনে অন্যতম অপরাধী মুকেশ সিং জেলে বসে এক তথ্যচিত্রের জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছে। তার সামান্য যতটুকু অংশ প্রকাশিত হয়েছে তাতেই শিউরে উঠেছে দেশের মানুষ। মুকেশ বলেছে, 'মেয়েটা বাধা দিয়েছিল বলেই ওকে মরতে হয়েছে'। নির্বিকার মুখে সে জানিয়েছে কী ভাবে নির্ভয়ার জামা কাপড়, তার বন্ধুর জ্যাকেট তারা স্মারক হিসাবে রেখে দিয়েছিল। পাশবিক ঔদাসীন্যে বর্ণনা দিয়েছে নির্ভয়ার দেহ থেকে ছিঁড়ে নেওয়া নাড়িভুঁড়িগুলো কীভাবে তারা রাস্তায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল। বিবেকবান মানুষমাত্রই ক্ষুব্ধ হয়ে দাবি তুলেছেন, এই ঠাণ্ডা মাথার খুনি, জঘন্য অপরাধীর চরম শাস্তি অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।

১৬ ডিসেম্বর ২০১২, দিল্লির ২৩ বছরের প্যারামেডিকেল ছাত্রী বারংবার ধর্ষিতা ও মারাত্মক আহত হয়েও বারবার বলেছিল 'আমি বাঁচতে চাই'। জীবনের প্রতি তীব্র আকুতিতে ছয় নরপশুর বিরুদ্ধে একাই লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল সে। বাসের মধ্যে যখন তার দেহটাকে ওরা ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলছিল তখনও দমেনি সে। কিন্তু তার জীবন রক্ষা করা যায়নি। তার বাঁচবার এই তীব্র আকুতি সারা দেশের কোটি কোটি মানুষের বুকের মধ্যে তোলপাড় করে প্রশ্ন তুলেছিল, এই মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি না আমরা, এ কীসের সভ্যতা! এ কোন সমাজে আমরা বাস করছি? নিজেদের ঘরের দিকে তাকিয়ে তাঁদের প্রশ্ন ছিল, এ ঘটনা তো আমার ঘরেও ঘটতে পারত! দেশের মানুষের ব্যথাকে রূপ দিয়েছিল সেদিন দিল্লির বুকে আছড়ে পড়া ছাত্র-যুবদের বিক্ষোভ। এই নারকীয় ঘটনার প্রতিকার চেয়ে তাদের দৃপ্ত স্লোগান কম্পন তুলেছিল এ দেশের শাসনব্যবস্থার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা রাষ্ট্রপতি ভবন আর সংসদ ভবনের পাথুরে দেওয়ালে। সারা দেশ এই মেয়েকে ডেকেছিল নির্ভয়া বলে, কেউ বা বলেছিলেন ও হল দামিনী বা বিদ্যুৎ। কিন্তু সরকার চেয়েছে ছাত্র-যুবকদের ওই জাগ্রত বিবেক মরুক, না হলেও অন্তত আবার ঘুমিয়ে পড়ুক। তাই সরকারের বদল ঘটেছে, কিন্তু নির্ভয়ার

৪ মার্চ নির্ভয়ার ধর্ষকের অবিলম্বে ফাঁসির দাবিতে ছাত্র-যুব-মহিলা বিক্ষোভ মিছিল মধ্য কলকাতা পরিক্রমা করে

খুনিদের শাস্তি নিয়ে সেই টালবাহানা চলছেই। দিল্লির বুকে এবং সারা দেশে তারপরেও ধর্ষণ ও খুন চলছেই। যদিও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে আওয়াজও উঠছে, এটাই আশার কথা।

নির্ভয়া বাঁচতে চেয়েছিল, জীবনের জন্য লড়েছিল, মৃত্যুশয্যাতেও মর্যাদার স্বাক্ষর রেখেছিল, সেই মর্যাদাবোধেই নির্মম আঘাত করতে চেয়েছে এই ঠাণ্ডা মাথার খুনি। নির্ভয়ার ধর্ষণ এবং হত্যার বিরুদ্ধে যখন গোটা দেশ তোলপাড়, অপরাধীদের চরম শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের দাবি

দুয়ের পাতায় দেখুন

সংগ্রামী মন ও মর্যাদাবোধে ভাস্বর পরিচারিকাদের সম্মেলন

সেদিন জমায়েতের চেহারাটা ছিল অন্যরকম। প্রায় এক হাজার জন মহিলা— বেশিরভাগেরই শীর্ণ চেহারা, গরিবি আর কঠোর পরিশ্রমের ছাপ সর্বাঙ্গে। ভাঙা গাল, চোখের কোলে ক্লান্তির ছাপ। কিন্তু দৃষ্টিতে তাঁদের অদ্ভুত প্রখরতা। চোয়ালের দৃঢ়তায় খেটে-খাওয়া মানুষের আত্মমর্যাদার প্রকাশ, দাবি আদায়ের লড়াইয়ে হার না মানার শপথ।

এঁরা গৃহ-পরিচারিকা। সমাজের সবচেয়ে নিচের তলায় পড়ে থাকা মানুষ। নিজেদের দাবি-দাওয়া-অধিকার বুঝে নিতে ৩ মার্চ জড়ো হয়েছিলেন হাওড়ার শরৎ সদনে, সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির আহ্বানে তাঁদের প্রথম রাজ্য সম্মেলনে। মেদিনীপুরের এক পরিচারিকা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমরা পরিচারিকা, আমাদের সম্মান নেই। কিন্তু ভেবে দেখুন আমরা কাপড়টা না কেচে দিলে ধোপদুরস্ত পোশাকে বাবুরা পাঁচজনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবেন কি? এঁটো বাসনটা আমরা মেজে না দিলে, ঘর পরিষ্কার না করে দিলে ওঁরা সুস্থ শরীরে থাকতে পারবেন তো? ওঁদের বাইরের মান-সম্মান তো বাঁচিয়ে রাখি আমরাই। তা হলে আমাদের সম্মান নেই কেন?'

সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত মানুষ যখন তাঁদের জীবন-জীবিকার দাবি, অধিকার ও মর্যাদার দাবি ঘোষণা করেন তখন তাঁদের চোখ-মুখ, শরীরী ভঙ্গিমায় যে অনন্য দৃপ্ততা প্রকাশ পায় তারই উজ্জ্বল আলোয় সেদিন যেন ভরে ছিল শরৎ সদনের প্রতিটি কোণ। কোনও বিশৃঙ্খলা-ক্ষুদ্রতা-সংকীর্ণতা-মলিনতার ছোঁয়া ছিল না সেখানে। ছিল অফুরন্ত টগবগে সংগ্রামী আবেগ, যা লাঞ্ছনার বেদনাকে মুছিয়ে দার্জিলিং-এর রূপা মহান্ত, প্রতিমা সরকার, হুগলির যমুনা প্রামাণিক, দক্ষিণ ২৪ পরগণার সাজিদা খাতুন, হলদিয়ার সুমিত্রা পাত্রদের একটি নির্দিষ্ট মানসিক বন্ধনীতে আবদ্ধ করে ফেলল। পরিচারিকা সমিতির প্রথম রাজ্য

দুয়ের পাতায় দেখুন

পরিচারিকাদের রাজ্য সম্মেলন

একের পাতার পর

সম্মেলন সরকারের কাছে দাবি জানাল, পরিচারিকাদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে, ন্যূনতম মজুরি ও সপ্তাহে একদিন সবেতন ছুটি ঘোষণা করতে হবে, বি পি এল তালিকাভুক্ত করতে হবে, পরিচারিকা সহ পরিবারের বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ ও সন্তানদের শিক্ষার ব্যয়ভার গ্রহণ করতে হবে, বিধবা ও বার্ধক্য ভাতা চালু করতে হবে, পরিচারিকা ধর্ষণ ও হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

সম্মেলনে দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন অনেকে। একদিন-দু'দিন বা তিন দিনের কাজ কামাই হল। কী বলবে বাবুর বাড়ি? একজন বললেন, 'বাড়িতে অসুবিধা আছে বলে এসেছি'। আর একজন বললেন, 'শরীর খারাপ ছিল বলব'। দার্জিলিং-এর রূপা বললেন, 'মিথ্যে বলতে যাব কেন? মিটিং-এ যাচ্ছি বলে এসেছি। লড়াই করছি সে কথাই যদি না বলতে পারি, দাবি আদায় হবে কী করে?'

সম্মেলনে মদ্যপ স্বামীর মারের কথা, শ্বশুরবাড়ি, কাজের বাড়ির বাবুদের অত্যাচারের কথা, সন্তানদের শিক্ষা-স্বাস্থ্যহীনতার কথা বলেছেন অনেকেই। কিন্তু একটি কথা সকলেই বলেছেন তা হল লড়াই ছাড়া মর্যাদা নিয়ে বাঁচবার আর কোনও পথ নেই।

সম্মেলনের শুরু হয়েছিল শহিদ বেদিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে। প্রথম পর্ব প্রতিনিধি অধিবেশনে পরিচারিকা প্রতিনিধিরা ছাড়াও বক্তব্য রাখেন, সম্মেলনের প্রধান অতিথি এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য, বিশেষ অতিথি এ আই এম এস এস-এর রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী। এই অধিবেশন থেকেই সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির প্রথম রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। পার্বতী পাল সম্পাদিকা, লিলি পাল সভানেত্রী, বুলবুল আইচ কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। অভিনেত্রী চিত্রা সেন লিখিত বার্তায় সম্মেলনকে অভিনন্দন জানান। দুপুর ৩টায় শুরু হয় প্রকাশ্য অধিবেশন। এই অধিবেশনের প্রধান বক্তা এ আই এম এস এস-র সর্বভারতীয় সভানেত্রী এবং এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড ছায়া মুখার্জী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে 'সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি-ই একমাত্র সংগঠন যারা পরিচারিকাদের সংগঠিত করছে,বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আন্দোলনের চাপে বেশ কিছু দাবিও ইতিমধ্যে আদায় হয়েছে। এই সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। দিন যত যাবে সমস্যা আরও বাড়বে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে একদিকে মালিক, অপরদিকে মজুর। শোষকরা সমাজটাকে পরিচালনা করে। অন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই সমাজ। যে গরিব মানুষের ঘাম রক্ত ঝরিয়ে এ সমাজ তৈরি হয়েছে তার ঘরে খাদ্য নেই। যারা কাপড় তৈরি করে তাদের পরনে কাপড় নেই। যারা ঘর তৈরি করে তাদের ঘর নেই। মহিলাদের একটা বড় অংশ পরিচারিকার কাজ করেন। আমাদের দেশের অনেকেই তাঁদের হীন দৃষ্টিতে দেখে। পরিশ্রমের বিনিময়ে রোজগার করেন সবাই। কিন্তু সমাজ কিছু কাজকে ছোট, কিছু কাজকে বড় হিসাবে দেখায়। এ ভাবনা থেকে পরিচারিকাদের মুক্ত হতে হবে। পরিচারিকাদের হীনমন্যতা ত্যাগ করতে হবে, মর্যাদা নিয়ে দাঁড়াতে হবে। বেকারি, ছাঁটাই, দারিদ্র, কর্মহীনতা, মূল্যবোধহীনতার যে সমস্যা গোটা সমাজকে জর্জরিত করছে, পরিচারিকারাও তা থেকে মুক্ত নয়। এ সব সমস্যা এই শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার ফসল। সমাজে চুরি-দুর্নীতি-নারী নির্যাতন-ধর্ষণ বাড়ছে কেন? মাদকাসক্তি ও অশ্লীলতার ব্যাপক প্রসার হচ্ছে কেন? এটা দেশের শাসক শ্রেণিরই চক্রান্ত। মানুষকে তারা ন্যায়-অন্যায় বোধসম্পন্ন সুস্থ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে দিতে চায় না। কারণ মানুষকে 'মানুষ' হিসেবে গড়ে উঠতে দিলে ধীরে ধীরে এই বদ্ধ্যা সমাজকে ভেঙে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার আর্তি জন্ম নেবে তাদের মধ্যে। যে ব্যবস্থায় মালিক-মজুর বৈষম্য নেই সেই সমাজব্যবস্থার ভয়ে ভীত মালিক শ্রেণি তাই সমাজ জুড়ে আয়োজন করেছে অশ্লীলতার প্রচারের, ঢালাও প্রসার চলছে মদের। যুবসমাজকে এই নোংরা পাঁকে আটকে রাখতে চাইছে তারা। আবার শুধু মালিকের অত্যাচারই নয়, পুরুষ প্রধান সমাজের পুরুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধেও নারীর লড়াই চাই। পরিচারিকাদের লড়াইকে তাই আরও বৃহত্তর লড়াই-এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এ করতে পারলে বিজয় একদিন আসবেই।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং থানার নিকারিঘাটা-দাঁড়িয়া লোকাল কমিটির অন্তর্গত পাঙ্গাসখালি গ্রামের প্রবীণ কর্মী কমরেড আসরাফ আলি সরদার (৭৫) দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৩ ফেব্রুয়ারি নিজ বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়েই দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বাদল সরদার ও অন্য কর্মীরা প্রয়াত কমরেডের বাড়ি গিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

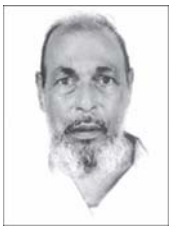

পেশায় স্কুল শিক্ষক কমরেড আসরাফ আলি সরদার ১৯৬৭ সালে উত্তাল চাষি আন্দোলনের সময়ে নিজেকে দলের সাথে যুক্ত করেন। স্থানীয় দু'জন জনপ্রিয় শিক্ষক কমরেড নূর আলি মণ্ডল ও কমরেড আক্কাছ আলি সেখের সাথে কমরেড আসরাফ আলি একত্রিত হয়ে সমগ্র এলাকায় দলের বৈপ্লবিক আদর্শের বার্তাবাহক হয়ে ওঠেন। এই তিন জনের প্রচেষ্টাতেই ওই এলাকায় কালক্রমে ঘরে ঘরে এস ইউ সি আই (সি)-র কর্মী-সমর্থক তৈরি হয়।

কমরেড আসরাফ আলি সরদার প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলনে শুধু নয়, সামগ্রিকভাবে শিক্ষা আন্দোলনেও ভূমিকা নেন। এলাকায় বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর। খুব শান্ত স্বভাবের এই কমরেড শেষ জীবনে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন।

কমরেড আসরাফ আলি সরদার
লাল সেলাম

নির্ভয়া তথ্যচিত্র বিতর্ক

একের পাতার পর

চারদিকে, তখন অপরাধীদের এই যে অনুতাপহীন মন নিজের বর্বরতা, নৃশংসতার পক্ষে সাফাই গায়, নির্বিকারভাবে মেয়েটাকেই দায়ী করে, সেই মন এল কোথা থেকে? কোন শিকড় থেকে সে তার বেঁচে থাকার রস আহরণ করে? সামন্তীযুগের এই নারী বিদ্বেষী মন আজ পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের জয়ধ্বনি সত্ত্বেও বহাল তবিয়তে বাঁচার রসদ পাচ্ছে কোথায়? পাচ্ছে এই পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের ভিত্তিমূলে যে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা রয়েছে তার থেকে। ফলে এই ব্যবস্থা যে সমাজমানসের ঐ ক্ষতকে দূর করতে পারে না, তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল বলেই পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে এসেছিল সমাজতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া যে নারীকে যথার্থ মনুষ্যত্বের মর্যাদায় ভাস্বর করে তুলেছিল এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। যে বৈশিষ্ট্য মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথেরও চোখ এড়ায়নি। সেই শোষণহীন ব্যবস্থা আজ সাময়িক হলেও অনুপস্থিত। তাই বিশ্বজুড়ে চলছে একচেটিয়া পুঁজির দাপট। যে দাপটকে ধরে রাখতেই সমাজ মননে পুরুষতন্ত্রের এই গভীর ক্ষতকে লালন পালন করছে, এই দগদগে ঘা কে বাড়িয়ে তুলছে আজকের সমাজব্যবস্থার কর্ণধাররা।

দেশের সরকার শুধু 'ইন্ডিয়াস ডটার' নামক তথ্যচিত্রটিকে দেশে প্রদর্শনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেই দায় সেরেছে। যেন সারা বিশ্বের কাছ থেকে মুকেশের এই মানসিকতাকে আড়াল করে রাখলেই সব সমস্যার সমাধান হবে? মুকেশের গলায় তো ভারতের পুরুষতন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি! বিশেষত বর্তমান হিন্দুত্ববাদী শাসককুলের নারী সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি যখন অনেকটাই মুকেশের ভাষার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে! এ যেন অনেকটা শিকারির হাত থেকে বাঁচার জন্য খরগোশের মুখটুকু লুকিয়ে ফেলার মতো হাস্যকর চেষ্টা। প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লার মঞ্চে দাঁড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে 'বেটি বাঁচাও' স্লোগান দিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবে বেটিদের মান-মর্যাদা-প্রাণ বাঁচাতে হলে গোটা দেশ জুড়ে যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ঝড় তোলা দরকার, মোদির দল তা পারবে না। বিজেপি যে হিন্দুত্বের ধ্বজা তুলছে তার সাথে তো ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে নারীকে নরকের দ্বার হিসাবে দেখার মানসিকতা। কংগ্রেসও পারেনি, কোনও পুঁজিবাদী দলের পক্ষেই তা সম্ভব নয়। সমাজের উচ্চকোটির মানুষজন কোন পথে চিন্তা করেন? মুকেশ এবং তার সহযোগীদের হয়ে আদালতে দাঁড়িয়েছিলেন যে আইনজীবীরা, তাঁদের দু'জন এম এল শর্মা এবং এ পি সিংহ ধর্ষণের জন্য মেয়েদেরই দায়ী করেছেন। শর্মা কোর্টে দাঁড়িয়ে ২০১৩ সালে বলেছিলেন, মেয়েরা উত্তেজনার রসদ জোগায় বলেই ছেলেরা ধর্ষণ করে। এ পি সিংহ পরিবারের সম্মান রক্ষার নামে মেয়েদের হত্যা বা অনার কিলিংকে সমর্থন জানিয়েছেন। শুধু এরাই নন, বিজেপির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির অন্যতম খুঁটি, ধর্মগুরু আশারাম বাপু নির্ভয়ার ঘটনার পরেই বলেছিলেন 'মেয়েটা ছেলেগুলিকে ভাই বলে ডাকলে আর ওরা ওকে মারত না। মেয়েটার জেদই এর জন্য দায়ী'। আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবত ইঙ্গিত করেছিলেন, মেয়েরা আধুনিক শিক্ষা লাভ করে বেশি করে কাজের জায়গায় আসছে বা রাস্তায় বার হচ্ছে বলেই তারা ধর্ষিতা হয়। ঘরে থাকলে তারা ধর্ষণের কবলে পড়ত না। তাঁর ভাষায়—'ইন্ডিয়াতে ধর্ষণ হয়, ভারতে হয় না'। অসংখ্য মেয়ে পরিবারের মধ্যে যেভাবে নির্যাতিতা হয়, এমনকী যৌন নিগ্রহের শিকার হয় তার খোঁজ তিনি রাখেন বলে মনে হয় না। দেশের উন্নয়নের কান্ডারি বলে প্রচারিত প্রধানমন্ত্রীর মনোভাব কেমন? তিনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বিরোধী এক নেত্রী সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, '৫০ কোটি টাকার গার্ল ফ্রেন্ড'। দিল্লির বিক্ষোভ যখন উত্তাল তখন রাষ্ট্রপতি পুত্র তথা কংগ্রেসের সাংসদ বিক্ষোভকারী ছাত্রীদের বলেছিলেন 'রঙ-চঙ মাখা মেয়ে'। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রাজ্যে এত ধর্ষণ কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে সাংবাদিকদের গুগল সার্চ দিয়ে দেখতে বলেছিলেন যে সর্বত্রই ধর্ষণ হয়, ফলে এটা খুবই সাধারণ ঘটনা। সমাজবাদী পার্টির নেতা মুলায়ম সিং যাদবের মতে, ছেলেরা ভুল করে ধর্ষণ করে ফেলে, তাদের ক্ষমা করে দেওয়া উচিত। মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রয়াত আর আর পাতিল বলেছিলেন ধর্ষণ হবেই, কারও ক্ষমতা নেই একে আটকানোর। সিবিআইয়ের প্রাক্তন ডিরেক্টর ধর্ষণ নিয়ে অক্লেশে রসিকতা করে বলেন, ধর্ষণ রুখতে না পারলে তা উপভোগ করুন। তৃণমূলের এক ফিল্ম স্টার সাংসদ একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন ঘাটালে নির্বাচনী প্রচারে। দুঃখের হলেও সত্য, তথাকথিত কোনও কোনও বামপন্থী নেতাও এই সুরে কথা বলেছেন। এই সব রথী-মহারথীরা এ ধরনের কথা বলেন কোন মানসিকতা থেকে? এঁরা নিজেরাই তো পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার মূর্ত প্রতীক। এই মন মেয়েদের পুরুষের সম্পত্তি হিসাবেই দেখে। সেই মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থবাহী বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা। তাই একচেটিয়া মালিকদের মালিকানাধীন সংবাদমাধ্যম নারী দিবসকে দেখায় গয়না আর ফ্যাশন শোয়ের দিন হিসাবে। নারী পুরুষ নির্বিশেষে কারও মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের বিকাশকে তারা ভয় পায়, মনুষ্যত্বকে মারতে চায়, যাতে প্রতিবাদের মন তৈরি না হয়। তার জন্য ছাত্র-যুবকদের নৈতিকতাকে তারা ধ্বংস করার আয়োজন করে। তাদের গড়ে তুলতে চায় যৌনতা সর্বস্ব মনুষ্য দেহধারী পশু হিসাবে। সরকার ঢালাও মদ, নেশার দ্রব্য প্রসারে মদত দেয়। মোবাইলে, ইন্টারনেটে ব্লু-ফিল্মের প্রসারে সরকার বাধা দেয় না। এর সাথে সমাজের পুরুষতান্ত্রিক মনন মিলে গিয়ে বহু যুগ ধরে নির্যাতিত নারীর স্থানকে আরও নিচে নামিয়ে আনে। যার মূল্য দিতে হয় নির্ভয়াদের মতো অসংখ্য মেয়েকে। যাদের পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠার।

যাঁরা সততার সঙ্গেই এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির প্রতিকার খুঁজছেন, তাঁদের ভাবতে হবে শোষণমূলক ব্যবস্থা পুঁজিবাদী সমাজ টিকে থাকলে এর যথার্থ সমাধান আদৌ কোনও দিন সম্ভব নয়। কোনও বুর্জোয়া দলের পক্ষেই এ কাজ অসম্ভব। এর জন্য যে বিকল্প সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে তার জন্য যথার্থ মার্কসবাদী দলের নেতৃত্ব আজ অবশ্য প্রয়োজনীয়। কেননা যে উন্নত রুচিবোধ, নৈতিকতার মান আজকের সমাজের এই ভয়াবহ দিকটিকে মোকাবিলা করতে পারে তা শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদের লড়াইয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সঠিক লক্ষ্যে পরিচালিত এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে নতুন যুগের উপযোগী সাংস্কৃতিক আন্দোলন। নির্ভয়ার জন্য বুকের মধ্যে যে ব্যথা মোচড় দেয়, তার সঠিক মূল্য এই পথেই দেওয়া সম্ভব।

পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার খেসারত দিচ্ছে গরিব ঘরের ছাত্ররাই

শিশুদের শিক্ষার অধিকার রক্ষায় দেশের সরকার সত্যিই বড় তৎপর। ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুর শিক্ষা যেহেতু 'অধিকার', তাই সেই অধিকার রক্ষার জন্য সরকারি কর্তাদের হন্বিতম্বি ও আয়োজন-উদ্যোগের কোনও অন্ত নেই। স্বভাবতই যে বা যারা এই অধিকার রক্ষার পথে সামান্যতম বাধাস্বরূপ বলে তাঁরা মনে করছেন, তার বিরুদ্ধেই তারা খড়্গহস্ত। যেমন — প্রশিক্ষণহীন শিক্ষক, যেমন — পাশ-ফেল প্রথা। আর রোগের দাওয়াই তাদের মতে খুবই সোজা। মাথাব্যথা কমাতে মাথাটাই কেটে বাদ দেওয়া।

সরকার এখন চিকিৎসকের ভূমিকায়। রোগ তাড়াতে প্রেসক্রিপশন বাতলানোই তাদের কাজ। সঙ্গে রয়েছে সেপাই-পেয়াদা। একবার প্রেসক্রিপশনটুকু শুধু তাদের পাওয়ার ওয়াস্তা। তারপর অনিচ্ছুক রোগীকেও কী করে সেই ওষুধ গেলানো যায়, সে ব্যবস্থা তাদের ভালোই জানা। অতএব দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এখন চলছে দারুণ গড়গড়িয়ে। অচিরেই আমরা নিশ্চিত খবর পাব, ১৪ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুই অষ্টম শ্রেণি পাশ। বুনিয়াদী শিক্ষা অতএব নিশ্চিতভাবেই তাদের করায়ত্ত।

তা না হয় বোঝা গেল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রসংঘের সভায় দেশের মুখরক্ষাও না হয় হল। কিন্তু ছেলেমেয়েরা শিখল কী? এই নিয়ে প্রশ্ন উঠলেই যত গোলমাল। দেশ জুড়ে বিভিন্ন রাজ্যে সমীক্ষায় যে তথ্য উঠে আসছে, তা কিন্তু বেশ ভয়ানক। দেখা যাচ্ছে, পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়ারা মাতৃভাষায় দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যও পড়ে উঠতে অক্ষম। যোগ, বিয়োগের মতো অঙ্কের একেবারে প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলিও তাদের কাছে অপরিচিত। আর ইংরেজি তো একেবারেই দূর গ্রহের বিষয়।

প্রাথমিক বুনিয়াদি শিক্ষার এই দুরবস্থা এটি কিন্তু একেবারেই সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির কথা, যেখানে শিক্ষা অবৈতনিক, দেশের আপামর নাগরিকদের জন্য। এর ঠিক পাশাপাশিই কিন্তু আর এক ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা দেশে বিদ্যমান। সেখানে রীতিমতো নগদ মোটা অর্থের বিনিময়েই শিক্ষা দেওয়া হয়। স্বভাবতই দেশের গরিবগুর্বো সাধারণ মানুষের সেখানে প্রবেশ প্রায় নাস্তি। অবশ্য আইন অনুযায়ী সেখানে ২৫ শতাংশ পড়ুয়াকে বিনাপয়সায় পড়ানোর কথা। কিন্তু সেই আইন কোথায় কতটা মান্য হয়, তা তো সহজেই অনুমেয়। আর যদি কোথাও তা মেনে চলাও হয়, দেশের বিপুল 'দিন আনি দিন খাই' জনসাধারণের এক অতি সামান্য অংশের পক্ষেই তার নাগাল পাওয়া সম্ভব। এবং সেটাও এক অর্থে দয়ার দান, অধিকার নয়। ফলে অনুগ্রহ পাওয়ার দামটাও সেখানে চড়া না হয়ে যায় না। অর্থাৎ, শিক্ষা এখানে মূলত আর্থিক দিক থেকে সবল নাগরিকদের জন্যই। 'ফেলো কড়ি মাখো তেল'-এর নিয়ম মেনেই এ সব জায়গায় কিন্তু চিত্রটা অনেকটাই আলাদা।

কিন্তু দেশের অধিকাংশ সাধারণ নাগরিকদের জন্য তো আর এই শিক্ষা নয়। তাদের জন্য যে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা, তা নিয়ে প্রতি মুহূর্তে

এত শোরগোলের পরেও তবে এই হাল কেন? কারণ মূলত দুটো — একে তো সরকারি স্কুলগুলিতে এখন প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সংখ্যক শিক্ষকই অমিল। তার উপর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল পদ্ধতির অনুপস্থিতি।

সরকারের যুক্তি অবশ্য নেহাতই সরল। পরীক্ষা ও পাশ-ফেল পদ্ধতি নাকি শিক্ষার্থীদের উপর অনাবশ্যক চাপ তৈরি করে। কুসুমকোমল ছাত্রছাত্রীদের সেই চাপের হাত থেকে মুক্তি দিতেই নাকি এই সিদ্ধান্ত। যুক্তি হিসেবে অবশ্যই শুনতে বেশ ভালো। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই এর আড়ালে বেশ ফাঁক ধরা পড়ে।

প্রথমে একটু ভেবে দেখা যাক, পরীক্ষা ও পাশ-ফেল প্রথার উদ্দেশ্য কী? নির্দিষ্ট একটি সময় ধরে শিক্ষার্থীকে যে শিক্ষা দেওয়া হল, তা থেকে সে কতটা গ্রহণ করতে পারল তা পরিমাপের উদ্দেশ্যেই পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে। এর প্রয়োজনীয়তা অনেক। শিক্ষক এ থেকে বুঝতে পারেন, তাঁর শিক্ষাদান কতটা ফলপ্রসূ হল, শিক্ষার্থীর কোন কোন দুর্বলতা রয়ে গেছে, কোন কোন দিকে সামগ্রিকভাবে বেশি জোর দেওয়া দরকার, অথবা শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রেও কোথাও কোনও ত্রুটি থেকে গেছে কি না এবং তা থাকলে কীভাবে তা সংশোধন করা যায় ইত্যাদি। অন্য দিকে শিক্ষার্থীরাও বুঝতে পারে তাদের নিজস্ব দুর্বলতা, শক্তি ও খামতির দিক, যা থেকে তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কিত ধারণার জন্ম হয়। পরীক্ষা প্রথার বদলে সরকার কন্টিনিউয়াস কম্প্রিহেনসিভ ইভ্যালুয়েশনের কথা বলে। কথাটি শুনতে বেশ রাশভারি, উপযুক্ত পরিকাঠামোয় হয়ত কিছুটা ফলদায়ক, কিন্তু তাতে পরীক্ষা পদ্ধতির উপরিউক্ত কার্যকারিতাগুলি কি অস্বীকার করা সম্ভব? বিশেষত যখন এই কাজের উপযোগী পরিকাঠামো গড়ে তোলার কোনও প্রচেষ্টাই যখন সরকার করেনি!

এবারে আসা যাক পাশ-ফেল প্রথা বিষয়ে। সরকারি যুক্তি এক্ষেত্রেও বেশ প্রাঞ্জল। ফেল মানে শিক্ষার্থীর শিক্ষার অধিকার হরণ করা। তাকে পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা। এবং ব্যর্থতার গ্লানি থেকে তাকে স্কুলছুটের দিকে ঠেলে দেওয়া। অতএব এটা অপরাধ। কোনওভাবেই তাই ফেল করানো সমর্থনযোগ্য নয়। তাই শিক্ষার্থীদের স্বার্থেই নাকি পাশ-ফেল প্রথার অবসান ঘটানোই যুক্তিযুক্ত।

যুক্তিগুলি অবশ্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গবাসীদের কাছে নতুন কিছু নয়। ১৯৮০-র দশকেই সেদিনের সিপিএম সরকার প্রাথমিক স্তরে থেকে ইংরেজিকে বিদায় জানানোর সাথে সাথে এই সব যুক্তি তুলেই চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথাকেও বিদায় জানিয়েছিল। সুদীর্ঘ ১৯ বছর ধরে এর বিরুদ্ধে সুকুমার সেন, নীহাররঞ্জন রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুশীল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রথিতযশা মানুষের নেতৃত্বে রাজ্যের জনগণ তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার পর ১৯৯৮ সালে এই দাবিতে সফল বাংলা বনধের ধাক্কায় তৃতীয় শ্রেণি থেকে ইংরেজি ফিরিয়ে আনা হলেও পাশ-ফেল প্রথা কিন্তু আর ফিরে আসেনি। তার ফল কী হয়েছিল তাও সকলেরই জানা। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক পরীক্ষানিরীক্ষা ইতিমধ্যেই

সাতের পাতায় দেখুন

৮ মার্চ ফিরে ফিরে আসে

কেউ সিরিয়াস, কারও হালকা চালের চটজলদি জবাব, আবার বেশ কিছু জন তুড়ি মেরে উড়িয়েই দিল, প্রশ্নের উত্তর মিলল না। প্রশ্ন ছিল ৮ মার্চে নারীর বিশেষ ভাবনা কী। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ৮ মার্চ — মহিলারা তা জানেন। তবে গয়না সহ নানা ধরনের কসমেটিকসের বিজ্ঞাপনের কল্যাণেই এই সর্বব্যাপী জ্ঞান অর্জন তা স্বীকার করলেন অনেকেই। এক বিবাহিত তরুণীর কাছে নারী দিবস মানে অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন। তবে অধিকার বলতে তিনি কী বোঝেন তা পরিষ্কার বলতে পারলেন না। দুই কলেজ ছাত্রী রাত করে বাড়ি ফেরা বা পোশাক নির্বাচনের স্বাধীনতাকেই অধিকার প্রতিষ্ঠা বলে মনে করে। প্রশ্ন ছিল নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা কার বিরুদ্ধে লড়াই করে? এক শিক্ষিত মহিলা বললেন, পুরুষের বিরুদ্ধে। নারী আন্দোলন কি পুরুষ বিরোধী আন্দোলন? নারীর নিজের মন-মানসিকতা-বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াই নেই? প্রশ্ন শুনে অনেকেই থতমত, নিরুত্তর। অল্পবয়সী একজনের গলায় প্রতিবাদের সুর ঝরে পড়ল। যে হারে নারীর উপর আক্রমণ হচ্ছে তাতে তাদের বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে করে। আধুনিক নারী মন-মানসিকতায় আধুনিক হয়েছে কি? সে নিজে যা সত্য বলে মনে করে তার জন্য যে কোনও কষ্ট স্বীকার করতে পারে কি? বা যারা সত্য প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে আছে তাদের পাশে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়াতে পারে কি? আধুনিকতার ধারণা কি তাকে এই ভাবে ভাবতে শেখায়? আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে চেতনার সন্ধানে এমন কিছু প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, মিশ্র জবাব মিলেছে। চিন্তার গভীরতা, তার অভাব—দুই-ই দেখা গেছে। আজকের প্রেক্ষিতে নারীর উপর শারীরিক নির্যাতনের কথা স্বাভাবিক ভাবেই বড় হয়ে উঠেছে।

৮ মার্চ। বহরমপুর

শহুরে মধ্যবিত্ত নারীর স্বাধীনতার সাথে গরিব শ্রমজীবী মহিলার স্বাধীনতা পাওয়ার ফারাক আছে। পুরুষের মতো তারা একই পরিশ্রম করলেও মজুরি তাদের কম। পরিচারিকার কাজ, ইট ভাটায় কাজ, রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ, ছোট ছোট কারখানায় কাজ, চা বাগানে কাজ— সর্বত্র মহিলারা পুরুষের চেয়ে কম মজুরিতে কাজ করছে এখনও। এমনকী উচ্চ পেশার অভিনেত্রীদেরও অভিযোগ পুরুষ অভিনেতাদের চেয়ে তাদের পারিশ্রমিক কম দেওয়ার রেওয়াজ আজও বহাল আছে। আবার কি গরিব কি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত নারী নানা ভাবে পুরুষের অবমাননা, নিগ্রহ, যৌন হেনস্থার শিকার হন। এমনকী নিগৃহীতা হওয়ার জন্য নারীকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়। হয় তার পোশাক, না হয় রাতে বাড়ির বাইরে থাকা বা শিক্ষিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি যে কোনও কিছুকে অজুহাত করা হয় নির্দ্বিধায়। সর্বোপরি পুরুষ নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বলে মনে করে। মনে করে নারী অন্তঃপুরেরই যোগ্য। মেয়েরা নিজেরাও বেশিরভাগ এই ধারণার বশবর্তী। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে, শিল্প-সংস্কৃতি জগতে সর্বত্র মেয়েরা কর্ম তৎপরতার স্বাক্ষর রাখলেও সমাজ মানসিকতার পরতে পরতে জড়িয়ে থাকছে এই ভাবনা। নারী দিবসে বিতর্কে অংশ নিয়ে তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণী সখেদে বললেন, সমাজে একজন মহিলা রাজনীতিবিদ বা আই পি এস-কে মেয়েদের অগ্রগতির স্মারক হিসাবে দেখানো হয়। কিন্তু একজনকে নিয়ে কি সমাজ? সমাজের কোটি কোটি নারী যখন পিছিয়ে আছে, তখন হাতে গোনা কিছুজনকে হিসাবে দেখিয়ে আসল অবস্থাকে চাপা দেওয়া হয়।

পুঁজিবাদী বাজারে আন্তর্জাতিক নারী দিবস আজ পণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কথাটি শোনা গেল এক খুচরো ব্যবসায়ীর কণ্ঠে। স্পেশাল ডিনার, স্পেশাল স্পা, শপিং-এর অফারে মুখ গুঁজে না থেকে এবার উইমেনস ডে সোলো ট্রাভেলিং— এর বিজ্ঞাপন সার্চ করতে বলা হচ্ছে ওয়েবে। তাঁর বক্তব্য এটাও একটা বিজনেস। এই দিন মহিলারা তাদের পণ্য বিক্রির টার্গেট গ্রুপ। এ তো গেল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পণ্যবাদী সংস্কৃতি। এদের স্বার্থে নানা ধরনের ডে রঙ-বেরঙের মোড়কে পরিবেশিত হচ্ছে। কখনও চকোলেট কোম্পানির ব্যবসা বাড়াতে, কখনও আরও বড় কোনও কর্পোরেট মিশন থাকে এর পিছনে।

কিন্তু আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আয়োজনে যখন খোলামেলা পোশাকের ফ্যাশন প্যারেড বা উদ্দাম নৃত্যের আয়োজন হয় তখন ভাবতে হয়, যে নারীরা একেই সমর্থন করে বসে আছেন তাঁদের মননে নারী মর্যাদার ধারণাটি কোথায় অবস্থান করছে।

তা হলে প্রশ্ন, নারী নিজে কি তার অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়েছে? সমাজ মনন এখনও নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক করে রেখেছে কেন? এই বিভাজনের উৎস কোথায়? অবসানই বা হবে কীভাবে? আধুনিক নারীর কাছে এই প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নারীর সমস্যা সমাজ বিচ্ছিন্ন নয়। ব্যক্তিগত নারীর সমস্যাও নয়। নারী শিক্ষা প্রচলনের জন্য বিদ্যাসাগর মশাইয়ের প্রাণপাত করা সংগ্রাম আজকের শিক্ষিত নারী কি স্মরণ করেন? শিক্ষার যে সুযোগ সে এখন পাচ্ছে তাকে ব্যক্তিগত আরাম আয়েশ, চাকরির

সাতের পাতায় দেখুন

বর্ধমানে আশা কর্মীদের মিছিল

আশা কর্মীদের স্বাস্থ্যকর্মীর মর্যাদা ও নতুন ফরম্যাট বাতিল সহ বিভিন্ন দাবিতে ১৯ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের ডাকে তিন শতাধিক আশা কর্মী মিছিল করে বর্ধমানের সি এম ও এইচ দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ও ডেপুটেশন দেন। ইউনিয়নের বর্ধমান জেলা সম্পাদক অরুণাংশু সরকার ও অন্যতম রাজ্য সংগঠক ইসমত আরা খাতুন বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন।

এ আই ইউ টি ইউ সি কলকাতা জেলা সম্মেলন

১ মার্চ সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে সুবর্ণ বণিক সমাজ হলে অনুষ্ঠিত হয় এ আই ইউ টি ইউ সি-র কলকাতা জেলা সম্মেলন।

সম্মেলনে চটকল, প্যারামেডিকেল, রেলওয়ে, গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স, কলকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্ট, ট্রামওয়েজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও সিমেন্ট শিল্পের শ্রমিক, সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক, ক্যুরিয়ার সার্ভিস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মচারী, নার্স, ব্যাঙ্ক-কর্মী (স্থায়ী ও ঠিকা), বিড়ি শ্রমিক, মোটরভ্যান চালক, রিকশ চালক, নির্মাণ কর্মী, আশা কর্মী, বেসরকারি পরিবহণ শ্রমিক, হকার, দোকান কর্মচারী, প্রাণীবন্ধু, কলকাতা পৌরসভার কর্মচারীদের প্রতিনিধি সহ আরও অনেক অংশের শ্রমিক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং অন্যান্য প্রস্তাবের উপর প্রতিনিধিরা প্রাণবন্ত আলোচনা করেন। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে বলেন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেই শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থবিরোধী যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, শ্রম আইন সংশোধন করে শ্রমিক-কর্মচারীদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে পুঁজিপতিদের সর্বোচ্চ মুনাফার ব্যবস্থা করে শ্রমিক-কর্মচারীদের নিঃস্ব করার পথ নিয়েছে। বাজেটে পিএফ, ইএসআই প্রভৃতির টাকা মালিকদের আত্মসাৎ করার অধিকার দেওয়ার প্রস্তাবের সাথে সাথে কর্পোরেট সংস্থাগুলির ব্যাপক কর ছাড় এবং সাধারণ মানুষের উপর ব্যাপক করের বোঝা চাপানোর প্রস্তাব দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে তীব্র শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এ আই ইউ টি ইউ সি-র প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে এই আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার জন্য তিনি আবেদন জানান। এই লক্ষ্যে ২৯ মার্চ সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন সফল করার আহ্বানও জানান তিনি।

সম্মেলন থেকে কমরেড বঙ্কিমচন্দ্র বেরাকে সভাপতি ও কমরেড শান্তি ঘোষকে সম্পাদক করে ২৪ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

নিগ্রহের পরিণামে হাবড়ায় ছাত্রীর আত্মহত্যা

প্রতিবাদে ডি এস ও-র রাস্তা অবরোধ

রাজ্য জুড়ে নারী নির্যাতন ও হত্যার যে মিছিল চলছে, ৩১ জানুয়ারি হাবড়ার ঘটনা সেই তালিকাকে আরও দীর্ঘায়িত করেছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছাত্রী পরীক্ষা প্রস্তুতির মধ্যেই নরপশুর নৃশংস অত্যাচারের শিকার হয় এবং অপমান থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। ন্যক্কারজনক এই ঘটনার প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কলেজ স্ট্রিট এবং হাজরাতে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়। হাজরাতে প্রতিবাদী মিছিল মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির দিকে এগোলে পুলিশ বাহিনী আটকে দেয় এবং সেখানেই দীর্ঘক্ষণ অবস্থান কর্মসূচি চলে। কলেজ স্ট্রিটে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে প্রতীকী অবরোধ সংগঠিত হয়। দু'টি জায়গাতেই সাধারণ মানুষের সাগ্রহ উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

বরানগর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে

আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার দাবিতে আন্দোলন

চুরাশি বছরে পুরনো বরানগর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ২৩ জানুয়ারি থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। এই ব্যাঙ্কের উপর নির্ভরশীল বরানগর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গরিব, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত বিশেষত ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পের ব্যবসায়ী সহ হাজার হাজার গ্রাহক তাঁদের কষ্টার্জিত আমানতের সবটুকু খোয়ানোর আশঙ্কায় আন্দোলনে নেমেছেন।

ব্যাঙ্ক বন্ধ হওয়ার খবর পেয়েই এস ইউ সি আই (সি)-র আঞ্চলিক কমিটি ১৫ ফেব্রুয়ারি ক্ষতিগ্রস্ত আমানতকারীদের নিয়ে এক কনভেনশনের উদ্যোগ নেয়। তার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে বরানগর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক কনজিউমারস সাফারার্স ফোরাম। এই সংগঠনের পক্ষ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি রেজিস্ট্রার অফ কো-অপারেটিভ সোসাইটির কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সমবায় দপ্তর ও ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের অর্থ ফেরতের কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ায় ১ মার্চ পাঁচ শতাধিক আমানতকারী বি টি রোড অবরোধ করেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে— জানিয়েছেন সংগঠনের অন্যতম আহ্বায়ক পূর্ণ সামন্ত।

শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকার রক্ষার দাবিতে রাজ্যে রাজ্যে বিক্ষোভ

কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক বিরোধী এবং মালিক ঘেঁষা শ্রম সংস্কার, সর্বক্ষেত্রে হায়ার অ্যান্ড ফায়ার নীতি প্রণয়ন, স্থায়ী শ্রমিকের বদলে কন্ট্রাক্ট নিয়োগ বৃদ্ধি, শ্রমিকের ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নেওয়া, শ্রমিকের পক্ষে দর কষাকষি এবং ইউনিয়ন করার ন্যায্য অধিকারের উপর ক্রমাগত আক্রমণের প্রতিবাদে 'অল ইন্ডিয়া সত্যাগ্রহ' দিবসে ২৬ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন রাজ্য থেকে কয়েক লক্ষ শ্রমিক দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিটে সমবেত হন।

গুজরাট

দিল্লি

সম কাজে সম মজুরি, অসংগঠিত ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১৫,০০০ টাকা মজুরি, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, সামাজিক সুরক্ষা সীমাবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা এবং সকলের জন্য পেনশনের দাবি করেন তাঁরা। জাতীয় উন্নতির নামে প্রতিরক্ষা, কয়লা, জীবনবিমা, রেলওয়ে ও সরকারি সংস্থায় বেসরকারি বিনিয়োগের তীব্র বিরোধিতা করেন বক্তারা।

এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, এ আই ইউ টি ইউ সি-র কমরেড আর কে শর্মা, সিটু-র কমরেড তপেন সেন, এ আই টি ইউ সি-র কমরেড বিদ্যাসাগর গিরি, এ আই সি সি টি ইউ-এর কমরেড সন্তোষ রাই। এছাড়াও বি এম এস, আই এন টি ইউ সি, এইচ এম এস, ইউ টি ইউ সি এবং টি ইউ সি সি নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

দেশের ৪৭ কোটি শ্রমিকের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে রাজস্থান সরকারের শ্রম আইন অনুসরণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সমস্ত রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে যে চিঠি পাঠিয়েছে, বক্তারা তার তীব্র সমালোচনা করেন।

হরিয়ানা

এদিন হরিয়ানা এবং গুজরাট সহ বিভিন্ন রাজ্যে একই দাবিতে ট্রেড ইউনিয়নগুলি যৌথভাবে বিক্ষোভ দেখায়।

বাঁচার মতো মজুরির দাবিতে

বিষ্ণুপুরে বিড়ি শ্রমিক সম্মেলন

বিড়ি শ্রমিকদের ন্যূনতম ২১৩ টাকা প্রতি হাজারে মজুরি, বিপিএল তালিকাভুক্তি, চিকিৎসাভাতা, সন্তানদের শিক্ষার জন্য স্টাইপেন্ড সহ বিভিন্ন দাবিতে ২৮ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুরের বিবির হাট চৌরাস্তার মোড়ে বিড়ি শ্রমিকদের সম্মেলনে তিন শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন, যাঁদের বড় অংশ ছিলেন মহিলা। সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড শান্তি ঘোষ। প্রধান অতিথি ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) দলের আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড অজয় ঘোষ। সম্মেলন থেকে কমরেড বিজন হাজরাকে সভাপতি ও কমরেড লক্ষ্মী খামারুকে সম্পাদক নির্বাচিত করে ২২ জনের কমিটি গঠিত হয়।

হোসিয়ারি শ্রমিকদের শ্রমমন্ত্রীকে ডেপুটেশন

পরিচয়পত্র প্রদান, মজুরি বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবিতে ২৩ ফেব্রুয়ারি এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তার আগে কলকাতার এসপ্ল্যানেডে শ্রমিকদের এক বিক্ষোভ সভা হয়

বুজরুকি নিষিদ্ধ করার আইনের দাবিতে পদযাত্রা ও কনভেনশন

বর্তমানে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি সত্ত্বেও সমাজমননে যেভাবে ধর্মবিশ্বাস, অন্ধতা, কূপমণ্ডুকতা ও কুসংস্কার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা যে কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিজ্ঞান অনুরাগী মানুষের কাছে খুবই উদ্বেগের। দেশের সর্বত্রই ভণ্ড 'সাধু', 'বাবা' বা মহাশক্তি নামধারী 'যোগী'রা নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রচার করে মানুষকে বোকা বানাচ্ছে। ওঝা-গুণিন-তান্ত্রিক-জানগুরু প্রভৃতি অলৌকিক শক্তির দাবিদারদের ঝাড়ফুঁক-তুকতাক-তন্ত্রমন্ত্র-ভেল্কিবাজি-বশীকরণ-বাণ মারা-তাবিজ-কবচ-মাদুলি-গ্রহরত্ন-তেলপড়া-জলপড়া-নখদর্পণ-বাটি চালান-ফেং শুইয়ের ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে। একবিংশ শতাব্দীতেও সাপে কাটা রোগী ওঝার কাছে বিষ ঝাড়তে গিয়ে মরছে, ডাইনি সন্দেহে নিরীহ মানুষকে পিটিয়ে খুন করা হচ্ছে, মানসিকভাবে অসুস্থ রোগীকে 'ভূতে ধরেছে' বলে প্রচার করে ভূত ছাড়ানোর নামে অকথ্য অত্যাচার করা হচ্ছে। টেলিভিশন চ্যানেলে ফলাও করে এই সব জিনিস প্রচার করা হচ্ছে। যেখানে সরকারের উচিত ছিল উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণের, সেখানে তারা সম্পূর্ণ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। মহারাষ্ট্রে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ নরেন্দ্র দাভোলকর এই সব মধ্যযুগীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করতে সরকারি পদক্ষেপ ও আইন প্রণয়নের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। দাভোলকরের প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিতে ২০১৩ সালের ২০ আগস্ট তাঁকে দুষ্কৃতীরা নৃশংসভাবে খুন করে। এর প্রতিক্রিয়ায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনতার যে প্রবল জনমত গড়ে ওঠে তার চাপে ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে মহারাষ্ট্র সরকার ওই সব কালা জাদু তথা বুজরুকি নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করতে বাধ্য হয়।

দেশের সমস্ত রাজ্যে অনুরূপ আইন প্রণয়নের দাবিতে গত বছর ১৭-১৯ অক্টোবর বাঙ্গালোরে ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রথম সর্বভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী-গবেষক-বিজ্ঞানকর্মীদের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গেও আইন প্রণয়নের দাবিতে ২৮ ফেব্রুয়ারি ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির উদ্যোগে ২৩ হাজার মানুষের গণস্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি নিয়ে পদযাত্রা ও রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন এবং কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

২৮ ফেব্রুয়ারি বেলা ১২টায় কলেজ স্কোয়ার বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে একটি সংক্ষিপ্ত সভা ও কুসংস্কার বিরোধী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক শত বিজ্ঞানী-শিক্ষক-গবেষক-বিজ্ঞান অনুরাগী মানুষের একটি সুসজ্জিত মিছিল মৌলালিতে রাজ্য যুবকেন্দ্রে এসে শেষ হয়। সেখান থেকে একটি প্রতিনিধিদল রাজ্যপালের হাতে গণস্বাক্ষর সংবলিত দাবিপত্র তুলে দেয়। বিকেল ৩টায় যুবকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় এক কনভেনশন। শুরুতে বাংলাদেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞান গবেষক, লেখক ও ব্লগার ডঃ অভিজিৎ রায়ের মৌলবাদীদের দ্বারা নৃশংস হত্যার বিরুদ্ধে এবং দোষীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন কনভেনশনের সভাপতি বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ ও সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়। কনভেনশনের মূল প্রস্তাব পেশ করেন ডঃ রাধাকান্ত কোনার। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক আশিষ লাহিড়ী, বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সমাজকর্মী ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু এবং সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি সুব্রত গৌড়ী। বক্তারা সকলেই অবিলম্বে তথাকথিত অলৌকিক শক্তিধারীদের বুজরুকি নিষিদ্ধকরণ আইন প্রবর্তনের দাবির যৌক্তিকতা ব্যক্ত করেন। কনভেনশনের মঞ্চে সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক সৌমিত্র ব্যানার্জী ও পশ্চিমবঙ্গ কমিটির কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক কার্তিক ঘাঁটা উপস্থিত ছিলেন।

সোয়াইন ফ্লু নিয়ে সেমিনার

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ ইউনিটের উদ্যোগে সোয়াইন ফ্লু ও তার বিপদ সম্পর্কে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হলে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। একশ কুড়ি জন ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে সোয়াইন ফ্লু ভাইরাসের উৎপত্তি, সংক্রমণ, রোগের লক্ষণ ও প্রতিরোধের বিষয়ে আলোচনা করেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য কাউন্সিল সদস্য ডাঃ চন্দন কুমার শিট। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ইউনিটের সদস্য সরিকুদ্দিন মণ্ডল।

সি পি ডি আর এস-এর ডেপুটেশন ঃ ২ মার্চ মানবাধিকার সংগঠন সি পি ডি আর এস-এর উদ্যোগে স্বাস্থ্য দপ্তরকে সোয়াইন ফ্লু সংক্রমণের বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতার ব্যবস্থা, হাসপাতালগুলিতে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য পৃথক ওয়ার্ডের ব্যবস্থা, চিকিৎসার আর্থিক দায়ভার সরকারকে নেওয়া, মৃতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা সহ নানা দাবি ডাঃ অমিত কুমার ধবলের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল জয়েন্ট ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস-এর সাথে এক বৈঠকে তুলে ধরেন।

ত্রিপুরায় কলেজ লাইব্রেরিতে বইয়ের দাবি ডি এস ও-র

২০১৫ সালের প্রথম সেমেস্টার পরীক্ষা শেষ হয়ে দ্বিতীয় সেমেস্টারের ইন্টারন্যাল অ্যাসেসমেন্ট পরীক্ষার সময় চলে আসার পরও দ্বিতীয় সেমেস্টারের বই পর্যাপ্ত পরিমাণে কলেজ লাইব্রেরিতে নেই। দ্রুত সেই বই সরবরাহ করা, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিলেবাস শেষ করা এবং পরীক্ষা শেষ হওয়ার ১০ দিনের মধ্যে ফল ঘোষণার ও শিক্ষার মান অক্ষুণ্ণ রাখার দাবিতে ১৩ ফেব্রুয়ারি অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-এর পক্ষ থেকে ত্রিপুরায় রামঠাকুর কলেজের অধ্যক্ষের কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়। তিনি দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে সেগুলি পূরণ করার আশ্বাস দেন।

শিক্ষা ও কাজের দাবিতে ছাত্র-যুব বিক্ষোভ ও অবরোধ

কলেজ স্ট্রিট মোড় অবরোধ

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল চালু, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতির নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি ও ছাত্রদের সকল ফি মকুব, শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ ও বেসরকারিকরণ বন্ধ, সকল বেকারের কাজ, নারী নিগ্রহ বন্ধ ও মদ-জুয়া বন্ধের দাবিতে ৯ মার্চ এ আই ডি এস ও - এ আই ডি ওয়াই ও কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ার থেকে ছাত্র-যুব বিক্ষোভ মিছিল মধ্য কলকাতা পরিক্রমা করে কলেজ স্ট্রিট মোড় অবরোধ করে। নেতৃত্ব দেন ডি এস ও রাজ্য সহসভাপতি কমরেড বনমালী পণ্ডা, জেলা সম্পাদক কমরেড চন্দন সাঁতরা, সভাপতি কমরেড সামসুল আলম এবং ডি ওয়াই ও-র জেলা সম্পাদক কমরেড সুপ্রিয় ভট্টাচার্য ও সভাপতি কমরেড সুকান্ত সিকদার।

মালদা শহরে মিছিল

উপরোক্ত দাবিতে ডি এস ও-র মালদা জেলা কমিটির উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল মালদা শহর পরিক্রমা করে।

চিকিৎসকদের নানা দাবিতে ইসলামপুরে সম্মেলন

উপযুক্ত ও বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নন-রেজিস্টার্ড চিকিৎসকদের স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় স্থায়ীপদে নিয়োগ, তাঁদের সরকারিভাবে নথিভুক্ত ও প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধ, ১০৮টি ওষুধ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদ সহ নয় দফা দাবিতে ৮ ফেব্রুয়ারি ইসলামপুরে মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন করে প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ প্রাণতোষ মাইতি বক্তব্য রাখেন। পিএমপিএ-র রাজ্য সহসভাপতি ডা. হান্নান হালদার গ্রামীণ ডাক্তারদের সমস্যা তুলে ধরেন। এম এস সি-র রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র সরকারি স্বাস্থ্য-পরিষেবার অব্যবস্থা নিয়ে আলোকপাত করেন। পিএমপিএর রাজ্য সহ সভাপতি ডাঃ রবিউল আলম সহ ইসলামপুরের ওসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ উপস্থিত ছিলেন। গ্রামীণ চিকিৎসদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রসূতি ও ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা নিয়ে আলোচনা সভা করেন ডাঃ গৌরাঙ্গ প্রামাণিক, প্রাক্তন প্রফেসর ডাঃ বিমানেশ মণ্ডল। সভা পরিচালনা করেন সম্মেলনের সভাপতি অবনীশ সিনহা। ৫ শতাধিক গ্রামীণ চিকিৎসক সহ সম্মেলনে উপস্থিত মানুষ স্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেন। ডাঃ গোলাম জিকিরিয়াকে সভাপতি এবং ডাঃ করিম বক্সকে সম্পাদক এবং ডাঃ বাদলুর রহমানকে কোষাধ্যক্ষ করে ৩৮ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

শিলিগুড়িতে বিজ্ঞান আলোচনা

'আধুনিক সমাজ ও মানবসভ্যতার উন্নতিতে বৈদিক বিজ্ঞানের কোনও ভূমিকা আছে কি?' এই বিষয়ে সায়েন্স ক্লাব ও ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে শিলিগুড়িতে ১ মার্চ একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার প্রায় ৫০ জন বিজ্ঞান অনুরাগী ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞানকর্মী এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে একটি মডেল পরীক্ষা দেখানোর মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

আলোচনা করেন ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং আই আই এস ই আর-এর অধ্যাপক সৌমিত্র ব্যানার্জী। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক ও বিজ্ঞানকর্মী সন্তু মণ্ডল এবং ডাঃ দীপক গিরি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সায়েন্স কলেজ, নর্থবেঙ্গল ইউনিভার্সিটি এবং শিবমন্দির এলাকা ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির শাখা গঠিত হয় ১৬ জন সদস্য নিয়ে। আগামী দিনে বুজরুকি বিরোধী আইন প্রণয়নের আন্দোলন জোরদার করার শপথ নেওয়া হয়।

শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকীকরণের প্রতিবাদে কর্মশালা

৩ মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা হলে 'শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকীকরণ, যুক্তিবিজ্ঞান বনাম অন্ধতা' শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর যেভাবে দেশের ইতিহাসকে বিকৃত করে শিক্ষাক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যানধারণার আমদানি করে ধর্মনিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, তার উপর সুপরিকল্পিত আক্রমণ নামিয়ে এনেছে, তাকে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মঞ্চ 'ডেমোক্রেটিক টিচার্স ফর অটোনমি অ্যান্ড অ্যাকাডেমিক ফ্রিডম (প্রোগ্রেসিভ)'-এর তরফে আয়োজিত এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষকরা তাদের মতামত রাখেন। আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অধ্যাপকরা আলোচনা করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক সৌমিত্র ব্যানার্জী (আই আই এস ই আর), অধ্যাপক সোমনাথ চক্রবর্তী (বিশ্বভারতী), অধ্যাপক শচীনন্দন সাউ (বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক মলয় রায় প্রমুখ। প্রায় একশত শিক্ষক কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

কার্ল মার্কস স্মরণে

একের পাতার পর

পূর্ববর্তী ইতিহাসের কোনও যুগেই কোনও দিন কল্পনাও করা যায়নি। অপরদিকে দেখা দিল ক্ষয়ের লক্ষণ, যা রোম সাম্রাজ্যের শেষাংশে অনুষ্ঠিত লিপিবদ্ধ বিভীষিকাকে অনেক ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের এ যুগে যেন সবকিছুর গর্ভেই তার বিপরীতের অস্তিত্ব। মানব-শ্রম লাঘবের ও তাকে ফলবান করার আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী যে যন্ত্র, সে যন্ত্রকে আমরা দেখছি মানুষকেই উপবাসী রাখছে, তাকে অতিরিক্ত খাটাচ্ছে। সম্পদের নতুন উদ্ভাবিত উৎসগুলি যেন কোনও অদ্ভুত ম্যাজিকে পরিণত হচ্ছে অভাবের কারণে। প্রযুক্তিবিজ্ঞানের জয়যাত্রার মূল্য দিতে হচ্ছে যেন চরিত্র খুইয়ে।

যে গতিতে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করছে, সেই গতিতেই যেন মানুষ অন্য মানুষের বা তার নিজেরই কলঙ্কের দাস হয়ে পড়ছে। এমনকী, বিজ্ঞানের পবিত্র আলোকও যেন অজ্ঞতার কৃষ্ণ পটভূমি ছাড়া দীপ্তি পায় না। আমাদের সমস্ত আবিষ্কার ও প্রগতির ফল যেন দাঁড়াচ্ছে যন্ত্র সমূহকে মানসক্রিয়ায় ভূষিত করা এবং মানবজীবনকে যন্ত্রের স্তরে নামিয়ে আনা।

একদিকে আধুনিক শিল্প ও বিজ্ঞান এবং অপরদিকে বর্তমান দুঃখ-দুর্দশা ও অবক্ষয়ের এই যে বিরোধ, আমাদের যুগে উৎপাদন শক্তি ও সমাজ সম্পর্কের মধ্যকার এই বিরোধ এমন এক সত্য যা জাজ্বল্যমান, সর্বব্যাপক ও তর্কাতীত। কোনও কোনও পার্টি এর জন্য বিলাপ করতে পারে; অন্যেরা হয়ত বর্তমান বিরোধের হাত থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে আধুনিক শিল্পের হাত থেকেই মুক্তি চায়। অথবা তারা এমন কল্পনাও করতে পারে যে, শিল্পক্ষেত্রের এই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি রাজনীতি ক্ষেত্রের এইরকম উল্লেখযোগ্য পশ্চাদগতি দিয়েই সম্পূর্ণ করতে হবে। আমাদের পক্ষ থেকে বলতে গেলে, এই সমস্ত বিরোধের মধ্যে যে তীক্ষ্ণ চেতনার প্রকাশ বরাবর দেখা যাচ্ছে, তার রূপনির্ধারণে আমরা ভুল করি না। আমরা জানি, সমাজের এই নবোদিত শক্তিসমূহ যথোচিতভাবে কার্যকরী হওয়ার জন্য দরকার শুধু নবোদিত মানুষের কর্তৃত্ব, আর তেমন মানুষ হল শ্রমজীবী মানুষ। যন্ত্র যেমন আধুনিক যুগের আবিষ্কার, এরাও ঠিক তেমনই। বুর্জোয়া, অভিজাতবর্গ এবং পশ্চাদগতির শোচনীয় পয়গম্বরেরা যে সংকেত দেখে বিভ্রান্ত বোধ করে তারই মধ্যে আমরা চিনে নিই আমাদের সেই বীর বন্ধু রবিন গুডফেলোকে — বিপ্লবকে। আধুনিক যন্ত্রশিল্পের অগ্রজ সন্তান হচ্ছে ইংরেজ শ্রমিকরা। তাই তারা নিশ্চয়ই সামাজিক বিপ্লবকে সাহায্য করতে পিছিয়ে থাকবে না, যে বিপ্লব জন্ম লাভ করছে এই শিল্প থেকেই; যে বিপ্লবের অর্থ হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী তাদেরই নিজস্ব শ্রেণির মুক্তি; যে বিপ্লবের অর্থ হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী তাদেরই নিজস্ব শ্রেণির মুক্তি; যে বিপ্লব পুঁজির শাসন ও মজুরি-শ্রমের দাসত্বের মতোই সর্বজনীন।

(১৮৫৬ সালের ১৪ এপ্রিল ইংরেজি ভাষায় মার্কসের বক্তৃতা চার্টিস্ট আন্দোলনের পত্রিকা 'দ্য পিপলস্ পেপার' ১৯ এপ্রিল, ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয়)।

কয়লার বর্ধিত পরিবহণ মাশুল ও সেস প্রত্যাহারের দাবি জানাল অ্যাবেকা

অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরী ২ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তির গবেষণা ও উৎপাদনে অর্থ যোগানের নামে সাধারণ বাজেটে কয়লার উপর ক্লিন এনার্জি সেস টন প্রতি ১০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০ টাকা করা হয়েছে। এ ছাড়া বাড়ানো হয়েছে পেট্রল ও ডিজেলের দাম। এর কয়েকদিন আগে রেল বাজেটে পণ্য মাশুল বৃদ্ধি করে কয়লার পরিবহণ মাশুল বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সব কিছুর ফলে বিদ্যুতের মাশুল ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। নাভিশ্বাস উঠবে সংকটগ্রস্ত ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কৃষি সহ সাধারণ গৃহস্থ শ্রেণির। আমরা অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের এই জনবিরোধী ও গ্রাহক স্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য লোকসভায় সোচ্চার হতে সমস্ত সাংসদের নিকট আবেদন জানাচ্ছি।

অভিজিৎ রায় হত্যার প্রতিবাদে শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চ

২৮ ফেব্রুয়ারি শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের উদ্যোগে কলকাতার আই পি এইচ ই অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এক সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বাংলাদেশের যুক্তিবাদী ও মুক্তমন আন্দোলনের সংগঠক, প্রকৌশলী অভিজিৎ রায়কে হত্যা ও তার স্ত্রী বন্যার উপর কাপুরুষোচিত আক্রমণের তীব্র নিন্দা করা হয়। বাংলাদেশে ধর্মান্ধ সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিরা মুক্তমন, যুক্তিবাদী গণতান্ত্রিক চেতনার কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য ক্রমাগত যেভাবে আক্রমণ করে চলেছে তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

প্রস্তাবে বলা হয়, আমাদের দেশ ভারতবর্ষেও আজ উগ্র ধর্মীয় শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত। কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনের নেতা নরেন্দ্র দাভোলকারকে এবং গোবিন্দ পানসারেকে প্রকাশ্যে দিবালোকে হত্যা করে এ দেশেও বাংলাদেশের মতোই মুক্তমন ও যুক্তিবাদের কণ্ঠ রোধ করতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে সকল অংশের গণতান্ত্রিক চিন্তাসম্পন্ন মানুষকে সজাগ ও সোচ্চার হতে প্রস্তাবে আহ্বান জানানো হয়।

গণধর্ষণের প্রতিবাদে মৌড়ীগ্রামে প্রতিবাদ সভা

২৬ ফেব্রুয়ারি হাওড়ার মৌড়ীগ্রাম রেল স্টেশনে দুষ্কৃতীরা এক মহিলাকে ধর্ষণ করে। এই নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে ২৮ ফেব্রুয়ারি স্টেশন বাজারে এস ইউ সি আই (সি) আন্দুল-মৌড়ী আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা চলাকালীন দলের আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে কমরেডস মিতা হোড়, বেবী দাস, রীতা ঘোষাল সহ নয় সদস্যের এক প্রতিনিধি দল স্টেশন ম্যানেজারের কাছে পাঁচ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি পেশ করে।

বিধানসভায় তরুণ নস্কর

রাজ্য বাজেট কর্মসংস্থানের কোনও দিশা দিতে পারেনি

২ মার্চ বিধানসভায় রাজ্য বাজেটকে জনবিরোধী আখ্যা দিয়ে এস ইউ সি আই (সি) বিধায়ক তরুণ নস্কর বলেন, গোটা বাজেট ভাষণে অর্থমন্ত্রী ১৯-২০ বার 'কর্মসংস্থানের সুযোগ' কথাটি ব্যবহার করেছেন। তার একটা ব্যাখ্যা হতে পারে —কর্মসংস্থানে ব্যর্থতা অর্থমন্ত্রীকে তাড়া করে বেড়িয়েছে, আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হতে পারে সত্যিই কর্মসংস্থান রাজ্য সরকার এত সৃষ্টি করেছে যে বারবার না বলে তাঁর উপায় ছিল না। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটাই সত্যি ধরে নিয়ে আমি মেলানোর চেষ্টা করছি।

কর্মসংস্থানের সংজ্ঞা কী? একটা লোক একদিন কাজ করল — তা কি কর্মসংস্থান? এক কোদাল মাটি কাটার সুযোগ হলেই কি কর্মসংস্থান হয়? চাকরি মানে কী? উপযুক্ত বেতনে সারা বছরের স্থায়ী কাজ। যত লক্ষ কর্মসংস্থানের কথা বলা হচ্ছে প্রতি বছর, তা যদি বাস্তবে হয়ে থাকে তা হলে আর কয়েক বছর পর তো অন্য রাজ্য থেকে লোক ধার করে আনতে হবে কাজ দেওয়ার জন্য! অর্থমন্ত্রীকে সম্বোধন করে তিনি বলেন, তাঁর দলের লোকজন এ কথা বিশ্বাস করে কি না! মন্ত্রী নিশ্চয় পরিযায়ী শ্রমিক বা মাইগ্রেটারি লেবার-এর খোঁজ রাখেন। রাজ্যে রাজ্যে তারা ঘুরে বেড়ায় কাজের খোঁজে, কাজ পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে না সাধারণত। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা থেকে আগে আসত এই রাজ্যে, কলকাতা শহরে। এখন ব্যাপারটা উল্টে গেছে। এখান থেকে তারা যায় হাজারে হাজারে — দিল্লি, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, কেরালায়। এরা বেশির ভাগ নির্মাণ শ্রমিক। মহিলারা পরিচারিকার কাজের জন্যও যায়। এমনকী তাদের অনেক সময় যৌনকর্মী হিসাবে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। নির্মাণ শ্রমিকদের ১৪-১৬ ঘন্টা কাজ করতে হয়, মহিলাদের দৈনিক মজুরি ৬০-৭০ টাকা, পুরুষদের ১০০-১৫০ টাকা। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকতে বাধ্য হয়, জল নেই, স্যানিটেশন নেই। কেরালায় প্রতিবছর ২ লক্ষ ৩৫ হাজার এমন শ্রমিক যায় বিভিন্ন রাজ্য থেকে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ কেরালা বিধানসভায় ঐ রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী রিপোর্ট পেশ করে জানান, এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সবার উপরে। আগামী ১০ বছরে ঐ রাজ্যে এই সংখ্যা ৪৮ লক্ষে পৌঁছাবে। পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থানের অবস্থা যদি এত ভালো তা হলে তো এই রাজ্যে বাইরে থেকে শ্রমিক আসত, এখান থেকে অন্য রাজ্যে যেত না।

আর্থিক সমীক্ষা কী বলছে? ১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মাত্র ১৪,৭৫৭ জন চাকরি পেয়েছে। এটাই হল প্রকৃত কর্মসংস্থান। বাকিটা বুজরুকি। নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা যেখানে ৩৯.৬ লক্ষ, সেখানে গত বছর মাত্র ১ লক্ষ বেকার ছেলেমেয়েকে ১৫০০ টাকা বেকার ভাতা দেওয়া হয়েছে। বাকিদের কী হবে?

রাজস্ব খাতে ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি ঘাটতি, নানা কনসেশান দিয়ে রাজস্ব আদায় করতে হচ্ছে। অথচ চা-বাগানের মালিকদের সেস ছাড়, বকেয়া সুদ মকুব করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আশ্চর্য হল এতে সাধারণ মানুষের জীবিকার সুবিধা হবে বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু চা-বাগানের শ্রমিকদের প্ল্যানটেশন লেবার অ্যাক্ট অনুযায়ী যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা তার উল্লেখ বাজেটে নেই। কী অমানবিক পরিবেশে এই শ্রমিকরা থাকেন চা-বাগানের বস্তিগুলোতে মন্ত্রী কি তা জানেন?

অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন, খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও সংগ্রহ নাকি সর্বকালীন রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। তা হলে খোলা বাজারে এত দাম কেন? বাজারে কোথাও কোনও সরকারি নিয়ন্ত্রণ আছে?

আই সি ডি এস কর্মী ও সহায়িকা, যাদের উপর মা ও শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের দায়িত্ব অনেকখানি, তাদের কথা কি সরকার ভাববে না? তাদের বেতন বাড়ানোর কোনও প্রস্তাব বাজেটে নেই। শিশুদের খাবারের জন্যও অনুদান বাড়ানোর কোনও প্রস্তাব নেই।

বাজেটে কিছু দান-খয়রাতির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সামনে পৌরসভা নির্বাচন, পরের বছর বিধানসভা। তার দিকে তাকিয়ে এই বাজেট তৈরি করা হয়েছে। অথচ স্কুল, কলেজের নানা স্তরের শিক্ষক — যেমন অতিথি, চুক্তিভিত্তিক, আংশিক সময়ের শিক্ষক — এঁরা দীর্ঘদিন ধরে বেতন বৃদ্ধির দাবি জানাচ্ছেন। মিছিল, ডেপুটেশন, ধরনা, অনশন, কী না তাঁরা করছেন। পুলিশ তাঁদের পেটাচ্ছে, টানতে টানতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের জন্য কোনও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত বাজেটে নেই। কোনও কোনও ক্ষেত্রে শিক্ষা দপ্তরের সুপারিশ সত্ত্বেও শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধিতে অর্থ দপ্তর বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। কেন শিক্ষকদের এত বঞ্চনা? ক্ষোভের সাথে কথাগুলি বলে বাজেটকে জনবিরোধী আখ্যা দিয়ে বিধায়ক তরুণ নস্কর তার বিরোধিতা করেন।

বিমানবন্দর বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে বিধানসভায় সর্বদলীয় প্রস্তাব সমর্থন

কলকাতা বিমানবন্দরকে বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে বিধানসভায় সর্বদলীয় প্রস্তাবকে সমর্থন করে ৪ মার্চ বিধায়ক তরুণ নস্কর বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র সমেত নানা সরকারি পরিকাঠামোকে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিচ্ছে। তারা ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিগুলির মূলধনের ৭০ হাজার কোটি টাকা বিলগ্নিকরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রতিরক্ষায় ৪৯ শতাংশ বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগের ব্যবস্থা করছে, বিমা আইন সংশোধন করে এই ক্ষেত্রে ২৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪৯ শতাংশ এফ ডি আই আনতে চাইছে। স্বাধীনতার পর জনগণের টাকায় গড়ে ওঠা রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিগুলি সত্যিকারের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছিল, যার সঙ্গে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রের বাজেট ভাষণে উল্লিখিত ভুয়ো কর্মসংস্থানের কোনও সম্পর্ক নেই। সেই সংস্থাগুলো বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার অধিকার তাদের কে দিয়েছে? ভোট চাওয়ার সময় তারা কি এই কথা বলে ভোট চেয়েছিলেন? যে কলকাতা বিমানবন্দরকে এই সেদিন জনসাধারণের ট্যাক্সের ২,৭০০ কোটি টাকা দিয়ে আধুনিকীকরণ করা হল, তাকে আজ পি পি পি মডেলের নামে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে? এই পি পি পি একটা প্রতারণা —বেসরকারিকরণের শ্রুতিমধুর প্রতিশব্দ ছাড়া আর কিছু নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এই অপচেষ্টার আমি তীব্র বিরোধিতা করছি।

পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার খেসারত

তিনের পাতার পর

এ দেশে হয়ে গেছে। সেই পরীক্ষায় গিনিপিগ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে আমাদের রাজ্যেরই কয়েকটি অসহায় প্রজন্ম। তার বাস্তব ফলাফলও চোখের সামনেই রয়েছে। কী আমরা দেখেছি সেখানে?

পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক শিক্ষার মান ক্রমাগত নেমে গেছে নিচের দিকে। পঞ্চম শ্রেণিতে এসে হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছে যেসব ছাত্র, শিক্ষকরা দেখছেন, তারা এমনকী বহুক্ষেত্রে অ-আ-ক-খ পর্যন্ত ঠিকমতো চেনে না। ফলে ক্লাসের পড়া বাদ দিয়ে তাদের আগের ঘাটতি মেটানোর প্রচেষ্টাতেই চলে গেছে বছর। সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রের নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশনও এ কথা স্বীকার করেছে। বর্তমানে 'শিক্ষা শিশুদের অধিকার' স্লোগানের আড়ালে এই পাশ-ফেল প্রথাবিহীন ব্যবস্থাই কেন্দ্রীয় সরকারি বিধানে ও রাজ্য সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় শুধু চতুর্থ শ্রেণি নয়, একেবারে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রসারিত। তার উপর আরও অদ্ভুত বিধান, একটি ছেলে যদি ১৩ বছর বয়সে প্রথম বিদ্যালয়ে এসে উপস্থিত হয়, তবে তার ইতিমধ্যে অর্জিত বিদ্যার কোনও রকম যাচাই পর্যন্ত না করে তাকে শুধুমাত্র বয়সের হিসেব কষে অষ্টম শ্রেণিতেই ভর্তি করতে হবে, এবং বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করে তাকে এক বছরের মধ্যেই বিগত আট বছরের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়ে বছরের শেষে নবম শ্রেণিতে উত্তীর্ণও করতে হবে। তাতে সে সত্যি সত্যি কী শিখবে, প্রশ্নটা বোধহয় আর না তোলাই ভালো।

পাশ-ফেল প্রথার প্রয়োজনীয়তা এবার একটু দেখে নেওয়া যাক। নির্দিষ্ট সময় অন্তর কোনও শিক্ষার্থীর শিক্ষার পরিমাপ (সহজ ভাষায় একেই আমরা পরীক্ষা বলে থাকি) করতে গিয়ে যদি দেখা যায়, তার শিক্ষার মান একটি ন্যূনতম ধাপও পার হতে পারেনি, তবে তো এ কথাই স্পষ্ট হয় যে, সেই নির্দিষ্ট সময়ে তার যে শিক্ষা অর্জন করার কথা ছিল তা করতে সে ব্যর্থ হয়েছে। সেক্ষেত্রে তাকে আরও একবার সেই শিক্ষা অর্জনের সুযোগ দেওয়াটাই তো বাঞ্ছনীয়। আমাদের নিতান্ত সাধারণ বুদ্ধি কী বলে? এক পর্যায়ের শিক্ষা অর্জিত না হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার্থীকে পরের ধাপে এগিয়ে দেওয়া তো অনেকটা কোনও বাড়ির ভিতটাই তৈরি না করে তিনতলা তৈরিতে হাত দেওয়ার মতো। এক্ষেত্রে তাকে পরীক্ষায় অকৃতকার্য ঘোষণা করে আগের শ্রেণিতে রেখে দেওয়ার অর্থ হল বাস্তবে তার শিক্ষার অধিকার হরণ করা নয়, শিক্ষার অধিকার রক্ষা, সেই অধিকারকে প্রকৃত স্বীকৃতিদান। পাশাপাশি এই ব্যর্থতা আরও কতগুলি শিক্ষা দেবে শিক্ষার্থীকে যেগুলি জীবনের পথে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সে বুঝতে শিখবে, জীবনের পথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। সেখানে অনেক বাধা অতিক্রম করেই কিছু অর্জন করতে হয়। পাশাপাশি ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা তাকে সাফল্য অর্জনের পথ খোঁজা ও ব্যর্থতার কারণ নির্ণয়ের বিষয়েও প্রাণিত করবে। অবশ্যই এজন্য একটা সহানুভূতিশীল পরিবেশ তার দরকার। বিদ্যালয়ে সে পরিবেশ তার প্রাপ্য। কোথাও এই পরিবেশ নেই বলে যদি সরকার মনে করে, তাহলে তা গড়ে দেওয়ার দায়িত্বটাও ছিল তাদেরই। কিন্তু সরকার সে পথে হাঁটেনি।

আরও একটি কারণেও পাশ-ফেল প্রথা আমাদের দেশে অত্যন্ত কার্যকরী। যদি নিজেদের শিক্ষাজীবনের অভিজ্ঞতা ভুলে না গিয়ে থাকি, তবে প্রায় সকলেই মনে করতে পারব, আমরা অধিকাংশই পরীক্ষার ঠিক আগে অন্য সময়ের তুলনায় অন্তত কিছু বেশি জোর দিয়ে পড়াশোনা করতাম। পরীক্ষার ভয় এক্ষেত্রে পড়াশোনার উদ্দীপক হিসেবে কাজ করত। এ নিয়ে সমালোচনা থাকতে পারে, কিন্তু পরীক্ষার সময় নিতান্ত অমনোযোগী ছাত্রও যে কিছুটা পড়াশোনা করে থাকে, এই সত্য অস্বীকার করা যায় কি? তা ছাড়া এখানে মাথায় রাখতে হবে দু'টি প্রশ্ন। আমরা এখানে বিদ্যালয় ছাত্রদের নিয়ে আলোচনা করছি, যারা যুক্তি দিয়ে সব কিছু বোঝবার মতো পরিণতি অবশ্যই অর্জন করেনি, তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে চাপ আখেরে তাদেরই লাভ ঘটায়। তা ছাড়া গরিব-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত ঘর থেকে উঠে আসা যে অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর বাড়িতে পড়াশোনা দেখিয়ে দেওয়ার, পরামর্শ দেওয়ার, দেখাশুনো করার যথেষ্টই অভাব, পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার ভয় যে তাদেরও ন্যূনতম শিক্ষাটুকু অর্জনের জন্য কিছুটা মনোযোগ আদায় করে দেয়, তাদের পরিবারের বড়রাও অন্তত এই সময় একটু পড়ার খোঁজ নেয়, সে সত্য অস্বীকার করার মানে বাস্তব থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকা ছাড়া কিছু নয়।

অর্থাৎ, আমরা দেখতে পাচ্ছি, শিক্ষার উন্নয়নের নানা ভালো ভালো কথার আড়ালে এখানে যে ব্যবস্থাগুলি দেশের সাধারণ মানুষের ঘাড়ে একরকম চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার ফল দ্বিবিধ। একদিকে এর ফলে শিক্ষার সাধারণ মান বাড়ার বদলে ক্রমাগত কমেই চলেছে। অন্যদিকে এর থেকে নিজের সন্তানকে রক্ষা করতে ক্রমাগত আরও আরও বেশি সংখ্যক মানুষ সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা থেকে একরকম বাধ্য হয়েই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থার শরণাপন্ন হতে বাধ্য হচ্ছেন। অর্থাৎ, তাঁদের রীতিমতো নগদের বিনিময়ে সেখানে শিক্ষা কিনতে হচ্ছে আর শিক্ষাব্যবসায়ীদের ব্যবসা বেশ ফুলেফেঁপে উঠছে। বিড়লা-আম্বানি কমিটি অবশ্য এই শতাব্দীর শুরুর দিকেই বেশ স্পষ্টভাবে এদেশে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা মূল্যের শিক্ষাব্যবসার সম্ভাবনার কথা বলেছিল ও দেশের সরকারকে সেভাবেই ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান দিয়েছিল। আর আমরা যা দেখছি তা হল, রাজ্যে বিগত শতকের আশির দশক থেকে অনুসৃত সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতি (প্রাথমিক থেকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল বিসর্জন) বাস্তবে রাজ্যে সমান্তরাল বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের আমলে তৈরি ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিও বাস্তবে একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা বাড়িয়ে তোলার পরিপূরক হিসেবেই কাজ করেছে। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিগত ইউপিএ সরকার পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম প্রবর্তিত শিক্ষানীতিকেই আরও বাড়িয়ে আরও ভালো ভাষার মোড়কে পুরে প্রয়োগ করেছে কেন্দ্রে। রাজ্যে সিপিএম-এর বিরুদ্ধে তৃণমূল বহু ক্ষেত্রে খড়্গহস্ত হলেও সিপিএম-এর শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে কোনওদিন কোনও আন্দোলনে তাদের দেখা গেছে বলে অন্তত রাজ্যের সাধারণ মানুষ মনে করতে পারে না। সরকারে এসে তারাও সেই পাশ-ফেল না থাকার নীতিই কঠোরভাবে প্রয়োগে ব্যস্ত। পার্থক্য শুধু এই যে, চতুর্থ শ্রেণির বদলে এবার তার কোপে পড়েছে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা। অবশ্য তাঁরা অজুহাত দিচ্ছেন যে এটি কেন্দ্রীয় আইন, তাই তাঁরা বাধ্য হয়েই এটা মানছেন। কিন্তু তিস্তা চুক্তি থেকে, জমি অধিগ্রহণ আইন নিয়ে তাঁদের যেরকম প্রতিবাদী কণ্ঠ কিছুটা হলেও শোনা গেছে, এক্ষেত্রে তার ছিটেফোঁটাও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। বর্তমানে কেন্দ্রে আসীন মোদির বিজেপি সরকার বিগত কংগ্রেস সরকারের অন্য অনেক নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে ক্ষমতায় এসে শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই একই নীতি নিয়ে চলেছে। শিক্ষা ব্যবসা বেড়েই চলেছে আর সাধারণের জন্য সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমাগতই আরও দুর্বল হয়ে চলেছে। অর্থাৎ, কেন্দ্র হোক বা রাজ্য, সরকারে যেই থাক, কংগ্রেস বা বিজেপি, তৃণমূল বা সিপিএম, নীতি কিন্তু থেকে যাচ্ছে আখেরে একই। লাভ হচ্ছে ব্যবসায়ীদের আর ক্ষতি হচ্ছে গরিব সাধারণ জনগণের। এইভাবে জনগণের স্বার্থ সংক্রান্ত কোনও বিশেষ বিষয়কে একটু নিরপেক্ষভাবে খুঁটিয়ে দেখলেই এইসব আপাতভাবে পরস্পরবিরোধী রকমারি দলগুলোর আসল শ্রেণি পরিচয় কেমন পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে আসে না?

ভ্রম সংশোধন ঃ গত সংখ্যায় হুগলি জেলা শ্রমিক সম্মেলনের সংবাদে নব নির্বাচিত সম্পাদক মিলন রক্ষিতের নামটি ভুল ছাপা হয়েছিল। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

৮ মার্চ ফিরে ফিরে আসে

তিনের পাতার পর

চাবিকাঠি হিসাবে না দেখে তা কি তাকে সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল করে তুলছে?

সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা, সামাজিক দায়িত্ববোধ একজন নারীকে কী করতে বলে? নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমাজে মানুষের উপর যে অন্যায় অবিচার চলছে সে সম্পর্কে তিনি সজাগ কি? সমাজে সর্বত্র প্রকাশ্যে গোপনে নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা চলছে। দারিদ্র, অনাহার থেকে বাঁচতে মা পর্যন্ত কন্যাকে ঠেলে দিচ্ছে উপার্জনের এই রাস্তায়। নারী পাচার এখন বিরাট ব্যবসা। আজকের শাসকদের নীরব মদত এর পিছনে। কন্যাভ্রূণ হত্যা, পারিবারিক হিংসা, অনার কিলিং, কথায় কথায় মেয়েদের অবমাননা, মেয়েদের অপুষ্টি, অশিক্ষা— নারীর প্রতি অসংখ্য অবিচারের বীজ কোথায় লুকিয়ে আছে নারীকেই তা খুঁজে বের করতে হবে। অসংখ্য নারীর বেদনাকে নিজের বেদনায় মিশিয়ে দিতে হবে। সেই বেদনাবোধ থেকে সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বার না করলে চলনে বলনে পোশাকে আধুনিকতার কোনও মানে থাকে না।

শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শাসক শ্রেণিকে সাহায্য করেছে ধর্ম। নারীকে অবদমিত করতে ধর্ম সমাজপতিদের সর্বতোভাবে সহায়তা করেছে। তাই দুনিয়ার সব ধর্ম নারীকে 'নরকের দ্বার' বলেছে। নারীকে ঘরে বাঁধতে চেয়েছে। আমাদের দেশেও মহাভারত এবং পুরাণে বারবার উচ্চারিত হয়েছে, 'পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে, রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'। শ্লোকের শেষে বলা হয়েছে, নারী স্বাধীনতার যোগ্যই নয়। 'অর্হতি' অর্থাৎ কোনওরকমেই যোগ্য নয়। আমাদের দেশে খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতক থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পর্যন্ত যে সব শাস্ত্র রচিত হয়েছিল, তাতে নারীকে নিজের দেহের বা সম্পত্তির ওপরে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বৈদিক ধর্মের সাহিত্য প্রাচীন সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সাহিত্য বলছে, ধন বা নিজ দেহের ওপরে নারীর কোনও অধিকার নেই। এই যুগ সামন্ততান্ত্রিক যুগ।

নারী স্বাধীনতা, নারী পুরুষের সমানাধিকারের দাবি প্রথম উঠেছিল ইউরোপে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নারীর সমানাধিকারের দাবি নানা ভাবে উঠতে থাকলেও ফরাসি বিপ্লবে স্পষ্টভাবে নারীদের সংঘবদ্ধ হওয়া, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, পুরুষের সমান অধিকারের লড়াই শুরু হয়ে যায়। বিপ্লবের আবর্তে সোচ্চার হওয়া ফ্রান্সের মেয়েরা তাই নারী আন্দোলনের পুরোধা। ধর্মীয় বেড়াজাল, নারীকে গৃহবন্দি রাখার সামন্ততান্ত্রিক কূপমণ্ডুকতা তাকে ভাঙতে হয়েছে। বিপ্লবের জোয়ারে মেয়েদের বিপুল অংশগ্রহণ অভিজাত এবং যাজক শ্রেণির ক্ষমতার মূল ধরে টান মেরেছিল। একবার জেগে ওঠা নারীকে আর ঘরে রাখা যায়নি। আধুনিক শিল্প তাকে ঘরের বাইরে পণ্য উৎপাদনে টেনে এনেছে। ইতিহাসের গতিপথেই বৃহৎ শিল্পে পুরুষের সাথেই শ্রমিক হিসাবে নারী যোগ দিয়েছে। ১৯০৭ সালে আমেরিকার পোশাক কারখানায় ধর্মঘটে এই নারী শ্রমিকরাই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু বুর্জোয়া ব্যবস্থা যেহেতু ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক শোষণের উপরই প্রতিষ্ঠিত হল, তাই তা নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারল না, নারীর প্রতি বৈষম্য-অবমাননা দূর করতে পারল না। ফরাসি বিপ্লব যে আওয়াজ তুলেছিল তাকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ। ক্লারা জেটকিন, লুইজ জেইটজের মতো সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রীরা দুনিয়াব্যাপী নারীকে পুঁজিবাদ এবং পুরুষতন্ত্রের নিগড় থেকে মুক্ত করতে ১৯১০ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করার ডাক দিয়েছিলেন। তৎকালীন প্রতিটি সামাজিক অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে নারীকে প্রতিবাদ করতে শিখিয়ে পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ার মধ্য দিয়ে নারী স্বাধীনতা অর্জন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই পথ থেকে নারী আন্দোলন সরে আসে। নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ইউরোপে নারী মুক্তি আনতে পারেনি। বরং তাকে সামাজিক দায়িত্ববোধহীন ভোগবাদের দিকে ঠেলে দিয়েছে। আমাদের দেশেও নারী আন্দোলনের নামে একদল এর চর্চা করছে। স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতাও যে অন্ধ আবেগ আর প্রবৃত্তির দাসত্ব করা তা এরা বুঝতে চান না। এই নারীবাদকে পুঁজিবাদী সমাজ উৎসাহিত করে।

আজকের পুঁজিবাদী সমাজ নারীকেও ভোগ্যপণ্য করে তুলেছে। ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির শিকার নারীও। এর থেকে মুক্ত হয়ে নারীকে তার যথার্থ মুক্তির জন্য লড়তে হবে। তার স্বাধীনতা পুরুষ পাইয়ে দিতে পারে না। নারীর উপর অত্যাচার, নারীকে ভোগপণ্য করে তোলার শাসকের চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাথে পুঁজিবাদী সমাজের শোষণ অত্যাচারের প্রতিবাদে নারীকে সামিল হতে হবে। পুঁজিবাদী সমাজ ভেঙে নতুন শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের শরিক হতে হবে। ব্যক্তি সম্পত্তিকে ভিত্তি করে যে শ্রেণিবিভক্ত সমাজ এসেছিল, সেই সমাজ পুরুষতন্ত্রের জন্ম দিয়েছিল, তাকে সমূলে উচ্ছেদ করতে হলে সেই শ্রেণি ব্যবস্থাকেই উচ্ছেদ করতে হবে। নারী পুরুষের প্রকৃত সাম্য তবেই প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই চেতনার রঙে পরিশুদ্ধ হয়ে নিজেকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের তকমা মুক্ত করতে ৮ মার্চ ফিরে ফিরে আসবে। নারীকে মনে করিয়ে দেবে ইতিহাস প্রদত্ত এই দায়িত্বের কথা।

হায়দ্রাবাদে মহিলা বিক্ষোভ

নির্ভয়ার ধর্ষণকারী যুবকের চূড়ান্ত অবমাননাকর বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ৭ মার্চ হায়দ্রাবাদে সেন্সর বোর্ড দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায় এ আই এম এস এস হায়দ্রাবাদ জেলার সদস্য-সমর্থকরা

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

মহারাষ্ট্র সরকারের সিদ্ধান্ত বৈষম্যমূলক ও সাম্প্রদায়িক

এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটি

মহারাষ্ট্রের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীর জন্য ৫ শতাংশ সংরক্ষণ, যা পূর্বতন কংগ্রেস সরকার চালু করেছিল, বর্তমান বিজেপি পরিচালিত মহারাষ্ট্র সরকার তা বাতিল করে দিয়েছে। একই সাথে সরকার গো-মাংস ভক্ষণকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটি ৬ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেছে, মহারাষ্ট্রে বিজেপি সরকারের এই দু'টি সিদ্ধান্তই হীন উদ্দেশ্যমূলক।

স্বাধীনতার পর জনমতের চাপে, তফসিলি জাতি ও উপজাতির জনগণের জন্য চাকরি ও শিক্ষায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা ভারত সরকার চালু করেছিল যাতে চূড়ান্ত বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া দলিত ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষজন, ব্রিটিশ শাসনে যারা উপেক্ষার শিকার হয়েছিল, তাদের জন্য আর্থিক সুবিধার ও মেধার বিকাশের সুযোগ দিয়ে সমাজের অন্যান্য অংশের জনগণের সাথে তাদের একই সারিতে নিয়ে আসা যায়। সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা ১০ বছর চালু রাখার পর পর্যালোচনা করে দেখা হবে, যে উদ্দেশ্যে সীমিত সময়ের জন্য সংরক্ষণ চালু করা হয়েছে, তা অর্জিত হল কি না। ঘটনা হল, পুঁজিবাদী ভারতে সংরক্ষণের ঘোষিত লক্ষ্য কখনওই অর্জিত হয়নি। শুধু তাই নয়, সময় যত গেছে, ততই সকল অংশের দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের সাথে সাথে দেশের অত্যন্ত পশ্চাদপদ ও সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত জনগণের অবস্থা— যাদের মধ্যে তফসিলি জাতি ও উপজাতি অংশই সংখ্যায় বেশি, ক্রমাগত আরও খারাপ হয়েছে। অন্যদিকে দেশের শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি সংরক্ষণ বিধিব্যবস্থার অপব্যবহার করে, নানা অন্যায় সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দিয়ে অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে ঐ বঞ্চিত অংশের মধ্য থেকেই একটি ক্ষুদ্র অংশকে নিজেদের কব্জায় টেনে নিয়েছে এবং এই উপায়ে পশ্চাদপদদের মধ্যে একটি 'ক্রিমি লেয়ার' অংশ তৈরি করতে সফল হয়েছে।

পশ্চাদপদ অংশের মধ্যকার এই ক্ষুদ্র 'অভিজাত' গোষ্ঠীটি এখন সমাজের ধনী সম্প্রদায়ের অঙ্গে পরিণত হয়ে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার ও প্রভাব খাটাবার ক্ষমতা ভোগ করছে। দলিত ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ সহ সমাজের দুর্দশাগ্রস্ত সকল অংশের মানুষের প্রতিই এই 'ক্ষুদ্র ক্ষীরভোগী' গোষ্ঠী চরম ঘৃণা ও অবজ্ঞা নিয়ে চলে। এরা কার্যত শাসক শ্রেণির তল্পিবাহকে পরিণত হয়েছে।

সংরক্ষণ বাস্তবে ভোটবাজ ক্ষমতালোভী বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলির হাতে জনগণকে লোভ দেখিয়ে ভোট ব্যাঙ্ক তৈরির হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সমাজে যারা আর্থিক ক্ষমতার মানদণ্ডে উঁচু স্তরে রয়েছে, সংরক্ষণের সুবিধা এমনকী তাদেরও দেওয়া হয়েছে। ফলে, কোনও সঠিক চিন্তার মানুষই সংরক্ষণব্যবস্থা সমর্থন করতে পারেন না, কারণ তা স্পষ্টতই নিপীড়িত জনগণ, বিশেষত পশ্চাদপদ ও উপজাতি জনগণের ভালো করার চেয়ে খারাপই করে বেশি, তদুপরি তা শোষিত মেহনতি জনগণের এক অংশের মনে অপর অংশ সম্পর্কে অবিশ্বাস ও অসম্প্রীতির জন্ম দেয়। কিন্তু সেজন্য কোনও সরকার যদি সংরক্ষণ ব্যবস্থাকেই সম্পূর্ণ বাতিল না করে বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য সংরক্ষণ বাতিল করে দেয় এবং দেশবাসীর একটি বড় অংশের খাদ্য গো-মাংস— যা সমগ্র বিশ্বেও এক বিরাট সংখ্যক মানুষের খাদ্য হিসাবে প্রচলিত — নিষিদ্ধ করে দেয়, তবে তা চরম বৈষম্যমূলক এবং এক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায় লক্ষ্যবস্তু হওয়ায় নিশ্চিতভাবেই তা সাম্প্রদায়িক। এই পটভূমিতেই বিজেপি সরকার কর্তৃক মুসলিমদের জন্য ৫ শতাংশ সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাতিল এবং গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তকে আমরা তীব্র ভাষায় নিন্দা করছি কারণ এই সিদ্ধান্তের পিছনে কাজ করেছে চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদ, যার ধ্বজা ওড়ায় বিজেপি-শিবসেনা, আর এস এস ও সংঘ পরিবারের সদস্যরা।

মহান স্ট্যালিন স্মরণ দিবসে

৫ মার্চ মহান স্ট্যালিন স্মরণ দিবসে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কলকাতায় কেন্দ্রীয় অফিসে রক্তপতাকা উত্তোলন ও মহান নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন পলিটব্যুরোর প্রবীণ সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর।

জয়নগরে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সভা

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি, ডি এ, পি এফ, বোনাস ও পেনশনের দাবিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শাখার বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ৭ মার্চ জয়নগরে এস ইউ সি আই (সি)-র জেলা দপ্তরের হলে। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা মাধবী পণ্ডিত, এ আই এম এস এস-এর রাজ্য সম্পাদিকা সুজাতা ব্যানার্জী, এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য কমিটির সদস্য অনিন্দ্য রায়চৌধুরী, জেলা কমিটির সদস্য মনিরুল ইসলাম সহ তপতী ভট্টাচার্য, শেফালি সেনাপতি, সুদীপ্তা আচার্য (ত্রিপাঠি), কৃষ্ণা পাল প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা অফিস সম্পাদক প্রজাপতি খালুয়া, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুবীর দাস। সভাপতিত্ব করেন প্রতিমা কামার। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শুভ্রা ঝকড়।

কোচবিহারে সভা

যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও-র কোচবিহার জেলা কমিটির উদ্যোগে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবীদের জীবন সংগ্রাম নিয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি গোসানিমারিতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড প্রভাত রায়। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর।

উচ্চশিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান পদে শিক্ষাবিদের পরিবর্তে শিক্ষামন্ত্রীকে বসানোর প্রতিবাদ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ৩ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন,

উচ্চশিক্ষা সংসদের মতো স্বশাসিত সংস্থার চেয়ারম্যান পদে একজন শিক্ষাবিদের পরিবর্তে রাজ্য সরকার শিক্ষামন্ত্রীকে বসাতে চাইছে। এই উদ্দেশ্যে আইনি সংস্থান করতে তারা চলতি বিধানসভা অধিবেশনে এই মর্মে একটি বিল আনতে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপে উচ্চশিক্ষা সংসদের মতো একটি স্বশাসিত সংস্থা তার স্বাধিকার হারিয়ে পুরোপুরি সরকারের কুক্ষিগত হয়ে পড়বে। সেক্যুলার ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রবর্তনের এবং শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণের দাবি তুলেছিলেন এ দেশের রেনেশাঁস আন্দোলনের মনীষী ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর নায়করা। তাঁদের আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে কেন্দ্র-রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলগুলি নানা কৌশলে একদিকে শিক্ষার স্বাধিকার হরণ করছে, অন্যদিকে শিক্ষাকে সংকুচিত করছে। রাজ্য সরকারের বর্তমান পদক্ষেপ তারই সম্প্রসারিত রূপ। আমরা সরকারের এই প্রচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করছি এবং রাজ্যের সমস্ত স্তরের শিক্ষানুরাগী মানুষকে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে আবেদন জানাচ্ছি।

একনজরে বিজেপি সরকারের বাজেট

পুঁজিপতিরা কী পেল?

১। পুঁজিপতিদের দেয় কর্পোরেট ট্যাক্স কমল ৫ শতাংশ। আগে দিতে হত ৩০ শতাংশ; এখন দিতে হবে ২৫ শতাংশ।

২। পুঁজিপতিদের ট্যাক্স ছাড়ের পরিমাণ বাড়ল। ২০১৩-১৪ সালে কর্পোরেট ক্ষেত্রকে ৫৭,৭৯৩ কোটি টাকা ছাড় দেওয়া হয়েছিল; চলতি আর্থিক বর্ষে ছাড় দেওয়া হল ৬২,৩৯৮ কোটি টাকা।

৩। সম্পত্তিকর উঠিয়ে দেওয়া হল। যত সম্পত্তির মালিক তাঁরা হন না কেন তার জন্য কোনও ট্যাক্স দিতে হবে না।

৪। বেসরকারিকরণের সিংহদুয়ার খুলে দেওয়া হল। ১২টি বড় বন্দর ছেড়ে দেওয়া হবে বেসরকারি হাতে। রাষ্ট্রায়ত্তসংস্থার শেয়ার বিক্রিরও সিদ্ধান্ত হয়েছে।

কী পেল সাধারণ মানুষ?

১। রেল বাজেটে পণ্য মাশুল ২ থেকে ১০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। ফলে সমস্ত জিনিসের দাম বাড়বে।

২। কয়লার উপর সেস দ্বিগুণ করা হয়েছে।

৩। সার্ভিস ট্যাক্স বা পরিষেবা কর ১২.৩৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৪ শতাংশ করা হয়েছে। ফলে বাড়বে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি।

৪। শিক্ষায় বরাদ্দ কমানো হয়েছে। স্কুল শিক্ষা এবং সাক্ষরতা বিভাগে গত বছরের বরাদ্দ ছিল ৫১,৮২৮ কোটি টাকা। এবার কমিয়ে করা হয়েছে ৩৯,০৩৮.৫০ কোটি টাকা। উচ্চ শিক্ষাতেও বরাদ্দ কমেছে প্রায় ১০০০ কোটি টাকার মতো।

৫। স্বাস্থ্য বাজেটও কমানো হয়েছে। গত বছর বরাদ্দ ছিল ৩৫,১৬৩ কোটি টাকা, এবার কমিয়ে করা হয়েছে ৩৩,১৫২ কোটি টাকা। জোর দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য বিমায়, যার অর্থ স্বাস্থ্য পরিষেবার দায় সরকার ঝেড়ে ফেলে বেসরকারি হাতে ছেড়ে দিতে চায়।

৬। গ্রামোন্নয়নে বরাদ্দ কমল ব্যাপক হারে। ২০১৩-১৪ সালে গ্রামোন্নয়নে বরাদ্দ ছিল ৫১,৭৫৭ কোটি টাকা। এবার কমানো হয়েছে ১০ শতাংশ।

৭। ইন্দিরা আবাস যোজনায় কমানো হয়েছে ৮,২০০ কোটি টাকা।

৮। কৃষিতে ২০১৩-১৪ সালে যোজনা বরাদ্দ ছিল ১৭,৭৮৮ কোটি টাকা। এবার বরাদ্দ হয়েছে ১১,৬৫৭ কোটি টাকা।

৯। সেচে বরাদ্দ ২০১৪-১৫ সালে ছিল ১৭৫৭ কোটি টাকা। এবারে কমে হয়েছে ৭৭২ কোটি টাকা।

১০। নারী ও শিশু কল্যাণে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে ৫৬ শতাংশ। আই সি ডি এস প্রকল্পে গত বছর বরাদ্দ ছিল ১৮,১০৮ কোটি টাকা। এবার করা হয়েছে ৮,২৪৫ কোটি টাকা।

১১। তফসিলি জাতি-আদিবাসী খাতে বরাদ্দ হ্রাস হয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকা।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২২৭৬২৫৯, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucic.in